প্রিয় হুমায়ূন আহমেদ

ইমদাদুল হক মিলন

প্রিয় হুমায়ূন আহমেদ

ইমদাদুল হক মিলন

অন্যপ্রকাশ

হুমায়ূন আহমেদের সঙ্গে যেদিন পরিচয় হলো সেদিন আমার মাথা ন্যাড়া।

জীবনে দুবার ন্যাড়া হওয়ার কথা আমার মনে আছে। একবার একাত্তরের মাঝামাঝি, আরেকবার তিরাশির শুরুর দিকে। দুবারই মন ভালো ছিল না।

একাত্তরে আমি এসএসসি ক্যান্ডিডেট। আমাদের বয়সী ছেলেরাও মুক্তিযুদ্ধে যাচ্ছে। এ কারণে বাবা আমাকে বাড়ি থেকে বেরোতে নিষেধ করে দিলেন। দুঃখে আমি ন্যাড়া হয়ে গেলাম। ন্যাড়া মাথা নিয়ে রাস্তায় বেরোতে লজ্জা করবে, ফলে বাড়ি থেকে বেরোনো হবে না।

সত্যি তা-ই হয়েছিল। ন্যাড়া মাথার কারণে একাত্তরের সময় অনেক দিন আমি বাড়ি থেকেই বেরোই নি। তিরাশি সালে সেই স্মৃতি মনে করেই ন্যাড়া হয়েছিলাম।

আমার তখন রুজি-রোজগার নেই।

একাশির অক্টোবরে জার্মানি থেকে ফিরে *রোববার* পত্রিকায় জয়েন করেছি। *ইত্তেফাক*-এর সামনে দিন-দুপুরে ট্রাকের তলায় এক পথচারীকে থেঁতলে যেতে দেখে *রোববার*-এ একটা রিপোর্ট লিখলাম, সেই রিপোর্টে বিশেষ একটি মন্তব্য করায় চাকরি চলে গেল। তারপর বন্ধুদের সঙ্গে 'দোয়েল' নামে একটা অ্যাডফার্ম করলাম। এক-দেড় বছরের মাথায় সেটাও বন্ধ হয়ে গেল।

তত দিনে বিয়ে করে ফেলেছি। কিন্তু পকেটে দশটি টাকাও নেই। এ অবস্থায় সিদ্ধান্ত নিলাম, সমরেশ বসু হয়ে যাব। লিখে জীবন ধারণ করব। কিন্তু বাংলাদেশের মতো দেশে সে যে কী কঠিন কাজ, আজকের কোনো তরুণ লেখক ভাবতেই পারবেন না।

তখন একটা গল্প লিখে পঞ্চাশ-এক শ' টাকা পাই। ঈদ সংখ্যার উপন্যাসের জন্য পাঁচ শ'-এক হাজার। তাও পেতে সময় লাগে তিন-চার মাস। লেখার জায়গায়ও কম। এত পত্রপত্রিকা তখন ছিল না। দৈনিক পত্রিকায় উপন্যাস ছাপার নিয়ম ছিল না।

কঠিন সময়।

দু-চারটা বই তত দিনে বেরিয়েছে, সেগুলোর অবস্থাও ভালো না। পাবলিশাররা টাকাই দিতে চায় না। একটা বিখ্যাত প্রকাশন সংস্থা তো অভাবী লেখক দেখে ষোল শ' টাকায় আমার দুটি বইয়ের গ্রন্থস্বত্বই কিনে নিয়েছিল। প্রথম প্রকাশিত বইয়ের জন্য আমি কোনো টাকাই পাই নি। এ অবস্থায় লিখে জীবন ধারণ! সত্যি, সাহস ছিল আমার!

সেইসব দিনের কথা ভাবলে এখনো বুক কাঁপে।

যা হোক, লিখে জীবন ধারণ মানে প্রতিদিন দিস্তা দিস্তা লেখা। লেখার জন্য সময় দেওয়া এবং ঘরে থাকা। কিন্তু সারা দিন ঘরে আমার মন বসবে কেমন করে! যখন-তখন বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা না দিলে আমার পেটের ভাত হজম হয় না। তখনই একাত্তরের ন্যাড়া হওয়ার স্মৃতি মনে এসেছিল। ন্যাড়া হয়ে গেলাম। ন্যাড়া মাথা নিয়ে সারা দিন ঘরে বসে উন্মাদের মতো লিখি। লেখার কষ্ট দেখে জ্যোৎস্না একদিন আমার ন্যাড়া মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বলেছিল, সাধ্য থাকলে তোমার লেখাগুলো আমি লিখে দিতাম।

সেবারের বাংলা একাডেমী বইমেলায় তিন-চারটা বই বেরোলো। *কালোঘোড়া, তাহারা* ইত্যাদি। বইয়ের বিক্রি বাড়াবার জন্য লজ্জা-শরমের মাথা খেয়ে ন্যাড়া মাথা নিয়েই মেলায় যাই। আমার অবস্থা যে বেশ ভালো তা বোঝাবার জন্য জার্মানি থেকে আনা জিনস-কেডস আর একেক দিন একেকটা শার্ট পরি। জ্যোৎস্নার মোটা ধরনের একটা সোনার চেন পরে রাখি গলায়। কিন্তু ভেতরে ভেতরে আমার অবস্থা তখন 'উপরে ফিটফাট, ভিতরে সদরঘাট'। পকেটে সিগ্রেট খাওয়ার পয়সা পর্যন্ত থাকে না।

বইমেলায় এক বিকেলে নওরোজ কিতাবিস্তানে বসে আছি। প্রতিষ্ঠানটি তখনো ভাগ হয় নি। আমার *তাহারা* বইটি হাতে নিয়ে চশমা পরা, রোগা, দেখলেই মেধাবী এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন মনে হয়, এমন একজন মানুষ সামনে এসে দাঁড়ালেন। অটোগ্রাফ।

মুখের দিকে তাকিয়ে দিশেহারা হয়ে গেলাম। নিজের অজান্তে উঠে দাঁড়ালাম। মুখটি আমার চেনা। ছবি দেখেছি। হুমায়ূন আহমেদ।

তখন পর্যন্ত খান ব্রাদার্স থেকে তাঁর তিনটি বই বেরিয়েছে। *নন্দিত নরকে, শঙ্খনীল কারাগার* আর বাংলাদেশের প্রথম সায়েন্স ফিকশন *তোমাদের জন্য ভালবাসা*। তিনটি বইয়ের কোনো-একটির ব্যাক কাভারে পাসপোর্ট সাইজের ছবিও আছে। আর কে না জানে, স্বাধীনতার পর পর *নন্দিত নরকে* বাংলাদেশের সবচেয়ে আলোচিত উপন্যাস। আহমদ শরীফ, শওকত আলী, আহমদ ছফা—এই সব শ্রদ্ধেয় মানুষ উপন্যাসটির প্রশংসায় পঞ্চমুখ। সনাতন পাঠক ছদ্মনামের আড়ালে বসে তখনই বিখ্যাত সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় *দেশ* পত্রিকায় *নন্দিত নরকের* উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন।

তিয়াত্তর-চুয়াত্তর সালের কথা। আমি জগন্নাথ কলেজে ইন্টারমিডিয়েট পড়ি। লেখার পোকা মাত্র মাথায় ঢুকেছে। আমার বন্ধু কামালের বন্ধু হচ্ছে খান ব্রাদার্সের মালিকের ছেলে ফেরদৌস। তার কাছ থেকে *নন্দিত নরকে* এবং *শঙ্খনীল কারাগার* জোগাড় করে আনল কামাল। মন্ত্রমুগ্ধের মতো সেই বই পড়লাম আমরা। পড়ে মুগ্ধ এবং বিস্মিত!

এমন লেখাও হয়! এত সহজ-সরল ভাষায়, এমন ভঙ্গিমায়, মধ্যবিত্ত জীবনের সামান্য ঘটনাকে এমন অসামান্য করে তোলা যায়!

সেই প্রথম হুমায়ূন আহমেদকে নিয়ে একটা ঘোর তৈরি হলো আমার। সদ্য স্বাধীন হওয়া দেশ, কত নতুন নতুন লেখক লিখতে শুরু করেছেন, এমনকি আমাদের প্রবীণ লেখকরাও নতুন লেখকদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে লিখছেন, কিন্তু বেশির ভাগ লেখকেরই লেখা আমি বুঝতে পারি না। ভাষার কারুকার্যে অযথাই জটিল। গল্পে গল্প খুঁজে পাওয়া যায় না। কায়দা-সর্বস্ব।

এ অবস্থায় দু-তিন বছরের মধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে আরও দু-তিনটি লেখা পড়লাম হুমায়ূন আহমেদের। *জনান্তিক* কিংবা এ ধরনের কোনো একটি লিটল ম্যাগাজিনে পড়লাম 'নিশিকাব্য' নামে এক আশ্চর্য সুন্দর গল্প। বাংলাবাজার থেকে *জোনাকী* নামে উল্টোরথ টাইপের একটি সিনেমা পত্রিকা বেরোত, সেই পত্রিকার কোনো-এক বিশেষ সংখ্যায় পড়লাম 'সূর্যের দিন'।

এই 'সূর্যের দিন'ই পরে *শ্যামল ছায়া* নামে বই হয়। যদিও *সূর্যের দিন* নামে পরে অন্য আরেকটি মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস লিখেছেন হুমায়ূন আহমেদ।

যা হোক *বিচিত্রার* ঈদ সংখ্যায় সে সময় উপন্যাস লিখলেন হুমায়ূন আহমেদ। 'নির্বাসন'। বুক হু হু করা এক প্রেমের উপন্যাস। তারও পর লিখলেন 'অন্যদিন'। এইসব লেখা পড়ে আমি বুঝে গেলাম, লেখা এমনই হওয়া উচিত। সাদামাটা নিজস্ব ভাষায়, নিজের মতো করে জীবনের কথা বলে যাওয়া, যা প্রত্যেক মানুষকে আলোড়িত করবে, দ্রুত পৌঁছাবে পাঠকের কাছে। বলতে দ্বিধা নেই, লেখায় সরলতার মন্ত্র আমি হুমায়ূন আহমেদের কাছ থেকেই পেয়েছিলাম।

কিন্তু বইমেলার সেই বিকেলের আগে তাঁকে কখনো চোখে দেখি নি। শুনেছি তিনি ছয় বছর ধরে আমেরিকায়, পলিমার কেমিস্ট্রিতে পিএইচডি করছেন। এদিকে বাজারে সম্ভবত চারটি মাত্র বই—*নন্দিত নরকে, শঙ্খনীল কারাগার, তোমাদের জন্য ভালবাসা* আর *নির্বাসন*। সেই চারটি বইয়ের কল্যাণেই বিরাশি সালে বাংলা একাডেমী পুরস্কার পেয়ে গেছেন। পরে শুনেছি, আমেরিকায় বসে তিনি যখন বাংলা একাডেমী পুরস্কার পাওয়ার কথা শুনলেন, শুনে তাঁর শিক্ষককে দিলেন খবরটা, আমেরিকান শিক্ষক হতভম্ব। তুমি কেমিস্ট্রির লোক, লিটারেচারে একাডেমী অ্যাওয়ার্ড পাও কী করে?

সেই শিক্ষক কি জানতেন, কালক্রমে বাংলা সাহিত্যের রসায়ন সম্পূর্ণ চলে আসবে হুমায়ূন আহমেদের হাতে! সাহিত্যের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদ তিনি অবলীলায় ছেড়ে আসবেন!

মনে আছে, তিরাশির বইমেলায় খান ব্রাদার্স থেকে বেরিয়েছে তাঁর *অন্যদিন* উন্যাসটি। মাঝখানে ছয় বছর লেখালেখি করেন নি, তবু *অন্যদিন* খুব ভালো বিক্রি হচ্ছে। এ অবস্থায় তিনি এসেছেন আমার অটোগ্রাফ নিতে। একজন স্বপ্নের মানুষ

এসে দাঁড়িয়ে আছেন সামনে। কিসের অটোগ্রাফ, আমি তাঁর পা ধরে সালাম করব কি না ভাবছি। কোনোরকমে শুধু বলেছি, হুমায়ূন ভাই, আপনাকে আমি চিনি। তিনি বললেন, আমি আমেরিকায় বসে খবর পেয়েছি বাংলাদেশে ইমদাদুল হক মিলন নামে একটি ছেলে গল্প-উপন্যাস লিখে জনপ্রিয় হয়েছে। তুমি কী লেখ আমার একটু বোঝা দরকার।

সেদিনই সন্ধ্যার পর আমাকে তিনি তাঁর ফ্ল্যাটে নিয়ে গেলেন। শ্যামলীতে এখন যেখানে শামসুর রাহমানের বাড়ি তার পেছন দিকে খোলা মতো মাঠ পেরিয়ে একটা বাড়ি। সেই বাড়ির দোতলা কিংবা তিনতলায় হুমায়ূন ভাইয়ের ফ্ল্যাট। খালাম্মা, শাহিন, মানে আজকের বিখ্যাত সম্পাদক-কার্টুনিস্ট এবং লেখক আহসান হাবিব, ছোটবোন, ভাবি, ফুটফুটে নোভা, শিলা, বিপাশা। বিপাশা তখন ভাবির কোলে। আর রফিকের মা নামে একজন বুয়া ছিল। পরবর্তী সময়ে এই বুয়াটির বহু মজার মজার আচরণ হুমায়ূন ভাইয়ের বিভিন্ন নাটকে হাসির উপাদান হয়ে এসেছে।

সেদিন আমার সঙ্গে আরও দুজন মানুষ গিয়েছিলেন হুমায়ূন ভাইয়ের ফ্ল্যাটে। *দৈনিক বাংলার* সালেহ চৌধুরী আর বাংলাদেশের প্রথম গ্রান্ডমাস্টার নিয়াজ মোরশেদ।

সালেহ চৌধুরীকে হুমায়ূন ভাই ডাকতেন 'নানাজি', আর নিয়াজ মোরশেদের দাবার তিনি ভক্ত। নিয়াজের জন্য ভালো রান্নাবান্না হয়েছিল বাসায়। গুলতেকিন ভাবি বেশ বড় সাইজের আস্ত একখানা ইলিশ মাছ ভেজে খুবই লোভনীয় ভঙ্গিতে সাজিয়ে রেখেছেন ট্রেতে। ইলিশটির ওপর ভাজা পেঁয়াজ ছড়ানো, চারপাশে চাক চাক করে কাটা টমেটো, শসা। ভাত-পোলাও দুটোই আছে, মাছ, মুরগি, সবজি, মিষ্টি—সব মিলিয়ে টেবিলভর্তি খাবার। নানাজি এবং নিয়াজ মোরশেদকে ভাবি চিনতেন। হুমায়ূন ভাই ভাবির সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। ভাবি তাঁর স্বভাবসুলভ হাসিমুখে আমার দিকে তাকালেন, একটু বুঝি অবাকও হলেন। ন্যাড়া মাথা, গলায় সোনার চেন, পরনে জিনস-কেডস, এ কেমন লেখক!

সেই সন্ধ্যায় সেই যে হুমায়ূন আহমেদ পরিবারের সঙ্গে আমি মিশে গেলাম, আজও সে রকম মিলেমিশেই আছি। আমাদের কোথাও কোনো গ্যাপ হয় নি।

হুমায়ূন ভাই তখন ঢাকা ইউনিভার্সিটির কেমিস্ট্রির অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর। ইউনিভার্সিটির কাজ সেরে শ্যামলীর ফ্ল্যাটে ফিরে যান, বিকেলবেলা আসেন ইউনিভার্সিটি টিচার্স ক্লাবে। সালেহ চৌধুরী আসেন, হুমায়ুন আজাদ আসেন, আমিও যাই। চা, সিগ্রেট, শিঙাড়া আর গল্পগুজব চলে।

সালেহ চৌধুরী গল্প শুরু করলে সহজে থামেন না। শুরুর আগেই হুমায়ুন আজাদ বলেন, কাহিনিটা কি খুব দীর্ঘ? দুজনের ছোটখাটো খুনসুটিও লাগে কোনো কোনো দিন। হুমায়ূন ভাই আর আমি চুপচাপ বসে থাকি।

হুমায়ূন ভাই চেয়ারে বসেন দু পা তুলে, আসনপিঁড়ি করে। সেই ভঙ্গিতে বসে মাথা নিচু করে চুপচাপ সিগ্রেট টানেন। তখন কথা বলতেন খুব কম। শুনতেন বেশি।

আর আমি শুধু তাঁকে খেয়াল করি। পরিচয়ের দিন থেকে ব্যক্তি, মানুষটাকেও তাঁর লেখার মতোই নেশা ধরানো মনে হচ্ছিল আমার। আস্তে-ধীরে হুমায়ূন নেশায় আচ্ছন্ন হচ্ছিলাম আমি।

এ সময় হুমায়ূন ভাইয়ের একবার জন্ডিস হলো। পেঁপে নিয়ে আমি তাঁকে দেখতে গেছি। জন্ডিসভরা শরীর নিয়েও এমন মজাদার আড্ডা দিলেন তিনি, আমি হতভম্ব। সেদিন প্রথম টের পেলাম, হুমায়ূন আহমেদ পুরনো হতে জানেন না, তিনি প্রতিদিন নতুন। এমন ঠাট্টাপ্রিয় মানুষ আমি আর দেখি নি। অবলীলাক্রমে নিজেকে নিয়েও ভয়ানক ঠাট্টা করতে পারেন। আর অসম্ভব মেধাবী, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন, আগাগোড়া যুক্তিবাদী, সম্পূর্ণ স্মার্ট এবং ভয়াবহ শিক্ষিত। জানেন না এমন বিষয় পৃথিবীতে কম আছে। অদ্ভুত সব বিষয়ে আসক্তি। হিপনোটিজম শেখার জন্য আমেরিকা থেকে দুবার নোবেল প্রাইজ পাওয়া প্রফেসর ফাইন ম্যানের বই আনলেন। *অন্যদিন* সম্পাদক মাজহারুল ইসলামকে হিপনোটাইজ করে ঘুম পাড়িয়ে দিলেন। ভূত, বিজ্ঞান, ধর্ম, ম্যাজিক, মানুষ আর মানুষের মনোজগৎ, সাহিত্য, গান, নাটক, সিনেমা, দাবা আর শিশু—এসব একত্রে ককটেল করলে যে জিনিসটা দাঁড়ায়, সেই জিনিসের নাম হুমায়ূন আহমেদ।

প্রচণ্ড শীতে নুহাশপল্লীতে শুটিং করতে এসেছে একটি গ্রাম্য মেয়ে। মা গেছে মেয়েটির জন্য শীতবস্ত্র জোগাড় করতে। পাতলা জামা পরা মেয়েটি ঠকঠক করে শীতে কাঁপছে। আগুন জ্বেলে তার চারপাশে লোকজন নিয়ে বসে আছেন হুমায়ূন ভাই। মেয়েটিকে খেয়াল করছেন। আগুনের পাশে আসতে মেয়েটি একটু লজ্জা পাচ্ছে, কারণ এখানকার কাউকে সে চেনে না। এর পরও শীত সহ্য করতে না পেরে আস্তে ধীরে আগুনের পাশে এসে দাঁড়ায়। সেই তাপেও তার শীত মানে না। হুমায়ূন ভাই উঠে গিয়ে নিজের কম্বল এনে দেন মেয়েটিকে। তারপর জিজ্ঞেস করেন, তুমি চেন আমাকে ? মেয়েটি তাঁর মুখের দিকে খানিক তাকিয়ে থেকে বলে, মনে হয় আপনে হুমায়ূন আহমেদ। আপনেরে আমি চিনছি।

যখন মাথায় যা আসে সেই কাজ না হওয়া পর্যন্ত স্বস্তি নেই হুমায়ূন ভাইয়ের। মনে হলো নুহাশপল্লীতে একটা অ্যাকুরিয়াম থাকা দরকার। বিশাল এক অ্যাকুরিয়াম বসালেন সুইমিংপুলের পাশে। বিদেশি নানা ধরনের মাছের সঙ্গে দুটো দেশি সরপুঁটি, কয়েকটা ট্যাংড়া, ছোট সাইজের গোটা চারেক ফলি ছাড়লেন। আমরা গেছি নুহাশপল্লীতে, আর্কিটেক্ট করিম ভাই গেছেন সস্ত্রীক, তাঁর বছর দু-আড়াইয়ের ছেলে রিশাদকে নিয়ে অ্যাকুরিয়ামের পাশে গিয়ে বসে রইলেন হুমায়ূন ভাই। রিশাদ তাঁকে ডাকে হাদা, তিনিও রিশাদকে ডাকেন হাদা। দুজনে এমন ভঙ্গিতে গল্প জুড়ে দিল, দেখে করিম ভাই বললেন, দুটো শিশু গল্প করছে।

অনেক বছর আগের কথা। অবসর এবং প্রতীক প্রকাশনীর মালিক আলমগীর রহমান তখন গেণ্ডারিয়ার বাড়িতে থাকেন। তাঁর একমাত্র পুত্র প্রতীকের জন্মদিন।

বেশ বড় আয়োজন করেছেন আলমগীর ভাই। বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে হঠাৎ সেখানে উপস্থিত হলেন হুমায়ূন ভাই, মুখে ভয়ংকর এক মুখোশ।

মাজহারের বছর দেড়েকের ছেলে অমিয় যখন-তখন এসে ওঠে হুমায়ূন ভাইয়ের কোলে। অমিয়র একমাত্র নেশা মোবাইল ফোন। মোবাইল দেখলে সে ধরবেই। যার যত মোবাইল হাতের কাছে পান, শিশুর ভঙ্গিতে অমিয়কে তা ধরিয়ে দেন হুমায়ূন ভাই।

শিশুদের সঙ্গে মেশার সময় তিনি শিশু হয়ে যান। এত মনোযোগ দেন শিশুদের দিকে, ভাবা যায় না। আর অসম্ভব আড্ডাপ্রিয়। একা বলতে গেলে চলতেই পারেন না, দলবল লাগে। কেউ দাওয়াত করলেও একা যান না। দলবল নিয়ে যাওয়া যাবে না এমন জায়গায় যাবেনই না। ঠান্ডা খাবার খেতে পারেন না, মাকড়সায় প্রচণ্ড ভয়, হঠাৎ করে রেগে যান। রাগ থাকে অল্প কিছুক্ষণ। কিন্তু সেই অল্প কিছুক্ষণের ঠেলা সামলাতে জান বেরিয়ে যায়। যার ওপর রাগেন তার সর্বোচ্চ শাস্তি কান ধরে উঠবস।

দুটো মাত্র গাল ব্যবহার করেন রাগের সময়, 'ফাজিল কোথাকার' আর 'খেতাপুড়ি'। কৃপণতা বলতে গেলে কিছু নেই। দুই হাতে খরচা করেন। ভালো রান্না না হলে খেতে পারেন না। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো খাদ্যরসিক। খান অল্প কিন্তু আয়োজন রাজকীয়। হঠাৎ করে চার হাজার টাকা দিয়ে একটা চিতল মাছ কিনে ফেললেন। ভাবিকে দিয়ে রান্না করিয়ে প্রিয়বন্ধুদের ডাকলেন। যত প্রিয় মানুষই হোক, তার বাড়িতে দাওয়াত খেতে গিয়ে যদি দেখেন রান্না খারাপ হয়েছে, মুখের ওপর বলে দেবেন। ভণিতা বলে কোনো কিছু হুমায়ূন ভাইয়ের নেই। সত্য কথা তিনি বলবেনই, কে কী ভাবল তোয়াক্কা করেন না। আপাতদৃষ্টিতে রুক্ষ, কাঠখোট্টা এবং প্রচণ্ড অহংকারী।

নুহাশের আগে তাঁর একটি ছেলে হয়ে মারা যায়, শুনে আমি গেছি দেখা করতে। তখন শহীদুল্লাহ্ হলের হাউস টিউটর তিনি। আমাকে দেখে খুবই বিরক্ত হয়ে বললেন, চলে যাও, আমার ভালো লাগছে না। কিন্তু চোখে পানি ছিল না তাঁর। অথচ নিজের লেখা পড়ে আমি তাঁকে কাঁদতে দেখেছি। নাটকের স্ক্রিপ্ট পড়তে পড়তে চোখ মুছছেন, কান্নায় বুজে আসছে গলা।

২

অদ্ভুত একটা স্বপ্ন দেখলাম একরাতে।

কোথাও বেশ একটা জনকোলাহল। অনেক সুন্দরী নারী। সম্ভবত কোথাও কোনো সাহিত্য সম্মেলন হচ্ছে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে দেখতে পেলাম আসরের মধ্যমণি হয়ে বসে আছেন। গান-গল্পে মুখর হয়ে আছে অনুষ্ঠান।

একসময় সুনীল উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমাকে এক্ষুনি ছুটতে হবে। প্লেন ধরতে হবে।'

তিনি কিছুক্ষণের জন্য উধাও হয়ে গেলেন। তারপর পোশাক বদলে একটা ব্যাগ হাতে বেরিয়ে এলেন। ব্যাগটা আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন, 'আমার পেছন পেছন এসো।'

একটা সময় দেখি কিছুতেই আমি আর তাঁর নাগাল পাচ্ছি না। তিনি আমাকে অনেকটা পেছনে ফেলে এগিয়ে গেছেন। হাঁটা বাদ দিয়ে তাঁকে ধরার জন্য আমি ছুটছি। সামনে একটা জলাশয়। সুনীলকে দেখি জলাশয়ের ওপারে। একবারও পেছন ফিরে তাকাচ্ছেন না, মাঝারি মানের মোটা শরীর নিয়ে হনহন করে হেঁটে যাচ্ছেন। আমি জলাশয় পেরিয়ে তাঁকে ধরার চেষ্টা করছি, পারছিই না।

এটুকুই স্বপ্ন। কী অর্থ ওই স্বপ্নের কে জানে।

তবে সুনীলদা আমাকে ফেলে নিউইয়র্কের লাগোর্ডিয়া বিমানবন্দর থেকে লস অ্যাঞ্জেলেসে চলে গিয়েছিলেন। সেবার হুমায়ূন ভাইও ছিলেন। নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের 'মুক্তধারা' বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান। মুক্তধারার কর্ণধার বিশ্বজিৎ সাহা বইমেলার আয়োজন করেছিলেন। বাংলাদেশ থেকে অতিথি হিসেবে গিয়েছিলাম হুমায়ূন আহমেদ আর আমি। কলকাতা থেকে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় আর সমরেশ মজুমদার। হুমায়ূন ভাই দল ছাড়া চলতে পারেন না। অন্যদিন গ্রুপের প্রধান নির্বাহী মাজহারুল ইসলাম আছেন আমাদের সঙ্গে, হুমায়ূন ভাইয়ের অতিপ্রিয় বন্ধু আর্কিটেক্ট আবু করিম আছেন। অন্যদিন গ্রুপের কমলও ছিলেন।

এই ঘটনা বলার আগে একটু পেছন ফিরি। হুমায়ূন আহমেদ সম্পর্কে বলি।

হুমায়ূন আহমেদ কোনো কিছু লুকাতে জানেন না, আড়াল করতে জানেন না। তিনি তাস খেলেন মাটিতে ফেলে। সবাই দেখতে পায় তাঁর হাতের তাস। সম্পূর্ণ নিজের মতো একটি জীবন তিনি যাপন করেন। যা ভালো লাগে, বিশ্বাস করেন, তা-ই করেন। কোনো কাজ করার আগে বন্ধুদের সঙ্গে খোলামেলা আলাপ-আলোচনা করেন, প্রত্যেকের মতামত নেন; কিন্তু করেন সেটাই, নিজে যেটা ভালো মনে করেন।

সেন্ট মার্টিনস দ্বীপে বেড়াতে গিয়ে ভাবলেন, এ রকম দ্বীপে একটা বাংলোবাড়ি করলে কেমন হয়? জায়গা কিনে বাড়ি করে ফেললেন। তাঁর সেই বাড়ি ইতিহাস হয়ে গেল। দেশের সব মানুষ জানে।

বাবা ফয়েজুর রহমান আহমেদ একাত্তরের বীর শহীদ, বাংলাদেশ সরকার তাঁর নামে স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশ করেছে, আর হুমায়ূন আহমেদ তাঁর পিতার স্মরণে ৭০ লাখ টাকা ব্যয় করে নিজ গ্রামে একটা স্কুল করেছেন। সেই স্কুলের ডিজাইন ও পরিবেশ স্কটল্যান্ডের মতো।

তাঁর নুহাশপল্লী এখন আপন মহিমায় বিখ্যাত। বহু লোক দেখতে যায়। ঢাকা-ময়মনসিংহ রোডে হোতাপাড়ার পশ্চিমে ঢুকে গেছে যে সড়ক, সেই সড়কের নাম 'নুহাশপল্লী সড়ক'। মোটকথা, হুমায়ূন আহমেদ যা করেছেন, তা-ই ইতিহাস হয়ে গেছে। জীবনে যা চেয়েছেন তিনি, পেয়েছেন তার চেয়ে বহুগুণ বেশি।

শাহাদৎ চৌধুরী সম্পাদিত একসময়কার বিখ্যাত সাপ্তাহিক *বিচিত্রাই* তাঁকে নিয়ে পাঁচ-ছয়বার কাভার স্টোরি করেছে, *রোববার, পূর্ণিমা, অন্যদিন* তো করেছেই, আরও কত পত্রিকা যে করেছে!

তাঁর একক বইমেলা হয়েছে বাংলাদেশের বহু জায়গায়, নিউইয়র্কে, ফ্রাংকফুর্টে। নিজের তৈরি ছবির ফেস্টিভ্যাল হয়েছে জাপানে। জাপানের বিখ্যাত টেলিভিশন এনএইচকে তাঁকে নিয়ে ১৭ মিনিটের ডকুমেন্টারি করেছে—'হু ইজ হু ইন এশিয়া'।

শাহরিয়ার কবির, অভিনেতা মাহফুজ আহমেদ তাঁকে নিয়ে বই লিখেছেন। 'কোথাও কেউ নেই' নাটকে বাকের ভাইয়ের যাতে ফাঁসি না হয়, সে জন্য মিছিল বেরিয়েছে ঢাকার রাস্তায়, পোস্টারিং হয়েছে। আসাদুজ্জামান নূরের মতো জনপ্রিয় অভিনেতা, এখন আওয়ামী লীগের বিখ্যাত নেতা এবং সংসদ সদস্য চাপা পড়ে গেছেন বাকের ভাইয়ের আড়ালে। এখনো লোকে তাঁকে বাকের ভাই বলেই চেনে।

নাটকটির শেষ পর্ব যেদিন প্রচারিত হয়, সেদিন হুমায়ূন ভাই বাড়িতে থাকতে পারেন নি। বাকেরের যাতে ফাঁসি না হয়, সে জন্য হাজার হাজার লোক এসে দাঁড়িয়েছিল তাঁর বাড়ির সামনে।

যেখানে হাত দিয়েছেন হুমায়ূন ভাই, সোনা ফলেছে। ব্যর্থতা বলে কোনো জিনিস হুমায়ূন আহমেদের ধারেকাছেও ভিড়তে পারে নি কখনো।

টিভি নাটক লিখতে এসে সম্পূর্ণ নতুন এবং নিজস্ব একটি ধারা তৈরি করে দিলেন তিনি। হুমায়ূন আহমেদের নাটক শুধুই হুমায়ূন আহমেদের নাটক, অন্য কারও সঙ্গে মেলে না, অন্য কেউ তাঁর মতো লিখতেও পারেন না। 'এইসব দিনরাত্রি' থেকে শুরু হলো। 'বহুব্রীহি', 'অয়োময়', 'কোথাও কেউ নেই'—আরও কত তুঙ্গস্পর্শী জনপ্রিয় নাটক!

সিনেমা করলেন, মধ্যবিত্ত শ্রেণী আবার হলে ফিরল। প্রথম ছবিতেই আট-দশটি ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড। অসাধারণ কিছু গান লিখলেন, যেমন—'এক যে ছিল সোনার কন্যা মেঘবরণ কেশ, ভাটি অঞ্চলে ছিল সেই কন্যার দেশ'। দুর্দান্ত কয়েকটি বিজ্ঞাপনচিত্র তৈরি করলেন, যেমন—হ্যামিলনের বংশীবাদকের মতো কুদ্দুস বয়াতির পেছনে ৪০-৫০টি শিশু ছুটছে। প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের বিজ্ঞাপন। তাঁর প্রায় প্রতিটি ধারাবাহিকের জনপ্রিয় চরিত্রদের নিয়ে বিজ্ঞাপন হয়েছে।

একটি নাটকে রাধারমণের গান ব্যবহার করলেন, 'আইজ পাশা খেলব রে শ্যাম'। গানটি জনপ্রিয়তায় রেকর্ড করল। সিনেমা-নাটকে ব্যবহার করে হাছন রাজার গানকে নতুন করে জনপ্রিয় করালেন তিনি।

তাঁর গল্প পড়ে রমাপদ চৌধুরী বলেন, বিশ্বের যে-কোনো ভাষার ভালো গল্পগুলোর সঙ্গে হুমায়ূন আহমেদের গল্প তুলনীয়। তিনিই একমাত্র বাঙালি লেখক, যিনি সাত বছর ধরে *দেশ* পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় উপন্যাস লিখেছেন। এই সৌভাগ্য আর কোনো বাঙালি লেখকের হয় নি।

আর তাঁর বইয়ের বিক্রি ?

অনেক বছর ধরে বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ মিলিয়ে হুমায়ূন আহমেদ সবচেয়ে জনপ্রিয় লেখক। তাঁর কোনো কোনো বই ৮০-৯০ হাজার কপিও বিক্রি হয়েছে। টাকার বস্তা নিয়ে প্রকাশকরা তাঁর বাড়ির দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। একসঙ্গে ৫০ লাখ টাকা অগ্রিম দেন কোনো প্রকাশক। তাঁর বই না পেয়ে হতাশায় ডায়াবেটিস হয়ে যায় প্রকাশকের। গাড়ি, ফ্ল্যাট হয়ে যায় পর পর কয়েক বছর বইমেলায় তাঁর একটি করে বই পাওয়া ভাগ্যবান প্রকাশকের। বইমেলায় যে স্টলে বসেন তিনি, ভিড় ঠেকাতে সেখানে আট-দশজন পুলিশ লাগে। আড়াই ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে তাঁর অটোগ্রাফ নিতেও ক্লান্ত হয় না পাঠক। তাঁর সঙ্গে এক দিনের জন্য আড্ডা দিতে নুহাশপল্লীতে কলকাতা থেকে ছুটে আসেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, বাড়িতে দেখা করতে আসেন শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, নুহাশ পদক দিতে তিনি ডাকেন সমরেশ মজুমদারকে।

কিশোর-তরুণ-তরুণী তো আছেই, অনেক শ্রদ্ধেয় ও বয়স্ক ভদ্রলোকও তাঁর ভক্ত, পেছন পেছন ঘুরছেন আর স্যার স্যার করছেন। অভিনেতা-অভিনেত্রী, পাঠক-প্রকাশক এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের কাছে তিনি স্যার। নিজ গ্রামে তিনি পীর সাহেব। লোকে তাঁকে তেমন করে মানে।

ভাবতে বিস্ময় লাগে, পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চি মাপের রোগা-পটকা একজন মানুষ কোন মন্ত্রবলে এমন আকাশছোঁয়া হয়ে ওঠেন, কী করে হয়ে ওঠেন কিংবদন্তি!

তাঁকে নিয়ে ভাবতে শুরু করলে ঘোর লেগে যায়। আমি আমার ঘোর কাটাতে আবার পেছন ফিরে তাকাই। হুমায়ূন ভাইয়ের আরও পেছনে ফেলে আসা জীবনটা দেখি।

শ্যামলীর বাসা ছেড়ে হুমায়ূন ভাই এরপর আজিমপুরে চলে এলেন। নিউমার্কেটের দক্ষিণ পাশ দিয়ে সোজা পশ্চিমে বিডিআর গেট, সেই গেটের বাঁ দিকের রাস্তা দিয়ে খানিক এগিয়ে হাতের ডানদিকে একটা রাস্তা ঢুকে গেছে, রাস্তার একপাশে একটা ডোবা আর কয়েকটা কবর, তার উল্টো পাশের বাড়িটির তিনতলায় ফ্ল্যাট।

তত দিনে জয়যাত্রা শুরু হয়ে গেছে তাঁর। ঈদ সংখ্যাগুলোতে একটার পর একটা উপন্যাস লিখছেন, বইয়ের পর বই বেরোচ্ছে, প্রতিদিনই বিস্ময়করভাবে বাড়ছে বইয়ের বিক্রি। প্রকাশকদের আসা-যাওয়া শুরু হয়ে গেছে। হুমায়ূন ভাইও প্রায়ই যাচ্ছেন বাংলাবাজারে। নওরোজ কিতাবিস্তানে ইফতেখার রসুল জর্জের ওখানে আড্ডা হয়। প্রায় নিয়মিত আসেন হেদায়েত হোসাইন মোরশেদ।

কখনো বিউটি বুক হাউস, কখনো স্টুডেন্ট ওয়েজ। আমি যাই। দু-চার দিন পর পরই হুমায়ূন ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হয়। কোনো কোনো দিন দুপুরবেলা আমাকে তিনি সঙ্গে করে বাড়ি নিয়ে যান। দুপুরে তাঁর ওখানে খেয়ে বিকেলবেলা ইউনিভার্সিটি ক্লাবে আড্ডা দিতে যাই।

এ সময় টেলিভিশনে শুরু হলো তাঁর দেশমাতানো ধারাবাহিক 'এইসব দিনরাত্রি'। নাটকটির পরিচালক মুস্তাফিজুর রহমান। মুস্তাফিজ ভাই তখন আজিমপুর স্টাফ কোয়ার্টারে থাকেন। আমাকে নিয়ে হুমায়ূন ভাই প্রায়ই তাঁর ওখানে যান, স্ক্রিপ্ট নিয়ে কথা হয়। কোনো কোনো দিন টিভি ভবনে রেকর্ডিংয়েও যাই আমি।

সেই সময় নিজেদের গ্রামে বাবার নামে একটা পাঠাগার করলেন হুমায়ূন ভাই। নির্মলেন্দু গুণ, হুমায়ুন আজাদ এবং আমাকে নিয়ে গেলেন উদ্বোধন করাতে। ফেরার দিন রাতে ময়মনসিংহ শহরে নির্মলেন্দু গুণের বাসায় থাকলাম। উহ্, সারাটা রাত নির্মলেন্দু গুণ আর হুমায়ুন আজাদ যে কী ঝগড়া করলেন! ঝগড়ার শ্রোতা আমি আর হুমায়ূন আহমেদ।

৩

এবার অন্য রকম একটি প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলি। তারপর আবার হুমায়ূন আহমেদের পেছনের জীবনের দিকে ফিরব।

হুমায়ূন ভাইয়ের যে-কোনো লেখাই গভীর আগ্রহ ও আনন্দ নিয়ে পড়ি। আমার ধারণা, তাঁর এমন কোনো লেখা নেই, যা আমি পড়ি নি।

বছর তিনেক আগের কথা, তখন অপেক্ষা করে থাকতাম তাঁর 'বলপয়েন্ট' লেখাটির জন্য। *সাপ্তাহিক ২০০০*-এ প্রতিসপ্তাহে বেরোচ্ছে 'বলপয়েন্ট'। এত স্বাদু রচনা, পড়তে শুরু করলে কখন শেষ হয়ে যায় টেরই পাই না। শেষ হওয়ার পর বিরক্ত লাগে। কেন মাত্র দেড়-দুই পৃষ্ঠা করে লিখছেন তিনি? কেন এই লেখা আরও বড় করে লিখছেন না?

এর মধ্যে একটি পর্বে দেখলাম আমাকে নিয়ে দু-তিনটি প্যারা লিখেছেন। পড়ে সন্ধ্যাবেলা তাঁকে ফোন করলাম। তিনি বিক্রমপুর থেকে ফোন ধরলেন। বিক্রমপুরের দীঘিরপার এলাকায় নাটকের শুটিং করতে গেছেন। গ্রামটির নাম কামাড়খাড়া।

এই গ্রামের পাশের গ্রাম বাণীখাড়ায় ছিল শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়দের বাড়ি। এলাকাটি আমার বিশেষ পরিচিত। ওই গ্রামে আমার এক দাদার বাড়ি। অর্থাৎ বাবার ফুফাতো চাচার বাড়ি। কিশোর বয়সে বহুবার সেই বাড়িতে গেছি। গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীটির নাম রজতরেখা।

হুমায়ূন ভাই ওই এলাকায় শুটিং করছেন আর সেদিনই অনেক দিন পর তাঁর সঙ্গে আমার কথা হচ্ছে ভেবে ভালো লাগল। আমাকে নিয়ে তিনি লিখেছেন সেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য ফোন করেছিলাম। কথায় কথায় বললাম, 'বলপয়েন্ট' লেখাটিকে মনে হচ্ছে 'কলম ছেড়ে দেওয়া লেখা'। কোনো পরিকল্পনা নেই, মাথায় এলোমেলোভাবে আছে স্মৃতিগুলো। কোন স্মৃতি আগের, কোনটি পরের—কোনো হিসাব নেই, কলম যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে, লেখাও এগোচ্ছে সেইভাবে। বলপয়েন্টের মূল আকর্ষণ এই জায়গায়।

কিন্তু যে কথা বলার জন্য হুমায়ূন ভাইকে ফোন করেছিলাম সেই কথাটাই বলা হলো না। এখন বলি। হুমায়ূন ভাই, আপনি লিখেছেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় আর সমরেশ মজুমদার ঢাকায় এসেছেন। সন্ধ্যাবেলা পার্টি হচ্ছে কোথাও। ঢাকার লেখক-শিল্পীরা অনেকেই আছেন সেখানে। পানাহার হইহল্লা আড্ডা চলছে। সেই আড্ডায় আমি সুনীল-সমরেশকে সমানে তুমি তুমি করে যাচ্ছি।

এখানটায় একটুখানি গণ্ডগোল আছে।

আমি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে কখনো তুমি বলি না। তাঁকে আপনি করেই বলি। সুনীলদা আপনি, বলি।

সমরেশ মজুমদারকে তুমি করে বলি।

পেছনে একটা ঘটনা আছে। '৯২-'৯৩ সালে সমরেশ মজুমদার প্রথম ঢাকায় এলেন। ফেব্রুয়ারির বইমেলা চলছে বাংলা একাডেমীতে। সমরেশকে ঢাকায় এনেছেন পার্ল পাবলিকেশন্সের আলতাফ হোসেন। আপনার-আমার দুজনের প্রিয় মিনু ভাই।

মিনু ভাই অকালে চলে গেছেন। এই মুহূর্তে তাঁর কথা খুব মনে পড়ছে। মিনু ভাই ঠোঁটকাটা লোক ছিলেন, হঠাৎ রেগে যেতেন; কিন্তু মনটা খুব ভালো ছিল!

একবার তাঁর বিদেশে থাকা এক আত্মীয় খুবই সুন্দর পিংক কালারের বেশ দামি একটা টি-শার্ট গিফট করেছেন মিনু ভাইকে। মিনু ভাই সেটা নিয়ে আমার গেণ্ডারিয়ার বাসায় গিয়ে হাজির। ওই টি-শার্টে নাকি আমাকে খুব মানাবে। বহুদিন মিনু ভাইয়ের দেওয়া সেই টি-শার্ট পরে আমি ঘুরে বেড়িয়েছি। ফেব্রুয়ারি বইমেলায় মিনু ভাইকে একটা বই দেব বলে অনেক দিন ঘুরিয়েছিলাম, সে কথা মনে করে আজ অনুতপ্ত হচ্ছি।

তো, সমরেশ ঢাকায় এসে মিনু ভাইয়ের সঙ্গেই আছেন। বাংলা একাডেমীতে মিনু ভাইয়ের স্টলের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। তখনো বাংলাদেশের পাঠক সমরেশকে সেভাবে চেনে না। আমি হাঁটতে হাঁটতে গেছি মিনু ভাইয়ের স্টলের সামনে। মিনু ভাই সমরেশের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন।

সমরেশের লেখা সম্পর্কে আমার কিছু ধারণা ছিল। তাঁর বহু লেখা আমি পড়েছি। বিশেষ করে *উত্তরাধিকার* উপন্যাসটি আমাকে মুগ্ধ করেছিল।

পরিচয়ের মুহূর্তেই সমরেশ যেটা করলেন, আমার কাঁধে একটা হাত দিলেন, দিয়ে বেশ একটা দাদাসুলভ ভঙ্গিতে কলকাতার ভাষায় বললেন, 'তা কী লিখছ আজগাল ?'

আচরণ এবং প্রশ্নে আন্তরিকতার অভাব ছিল না। কিন্তু আমার মনের ভেতর খুট করে একটা শব্দ হলো। বয়সে ছোট ইত্যাদি ভেবে কি তিনি আমাকে তুমি করে বলছেন ? নাকি লেখকসুলভ কোনো ভাব! লেখকদের তো নানা ধরনের ভাবচক্কর থাকে।

আমার মাথায় দুষ্টু একটা পোকা কামড় দিল। তাহলে আমিও সমরেশের সঙ্গে একটু ভাব নিই। ঘাড় বাঁকা করে সমরেশের মুখের দিকে তাকিয়ে অতিশয় নির্বিকার গলায় বললাম, 'তা, তুমি কী লিখছ?'

সমরেশ কিন্তু ব্যাপারটা সহজভাবেই নিলেন। ওই বিকেলেই আমাদের বন্ধুত্ব হয়ে গেল। আমি সমরেশকে 'তুমি' করেই বলতে লাগলাম। সঙ্গে 'দা'টা লাগিয়ে দিলাম।

কিন্তু হুমায়ূন ভাই, আপনি এই তুমি তুমিটা একদমই পছন্দ করছিলেন না। একদিন খুবই বিরক্ত হয়ে কথাটা আমাকে বলেছিলেন। যখন আমি ঘটনাটা বললাম, শুনে আপনি খুব মজা পেয়েছিলেন। তবে তারপর দু-একবার সমরেশদাকে আমি আপনি করে বলার চেষ্টা করেছি, ব্যাপারটা তিনি স্বাভাবিকভাবে নেন নি। মাইন্ড করেছেন।

২০০৯-এর এপ্রিলে কলকাতায় গেছি। সমরেশদার সঙ্গে দেখা। বললাম, কেমন আছেন, সমরেশদা?

সমরেশদা গম্ভীর গলায় বললেন, 'তুমি কিন্তু আমাকে তুমি করে বলতে?'

এবার অন্য প্রসঙ্গ।

মনে আছে, হুমায়ূন ভাইয়ের আজিমপুরের ফ্ল্যাটেই মুহম্মদ জাফর ইকবালের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। তখন তিনি আমেরিকায় থাকেন। ছুটিতে দেশে এসেছেন। আমি মুহম্মদ জাফর ইকবালেরও ভক্ত পাঠক। যত দূর জানি, তখন পর্যন্ত তাঁর দুটি মাত্র বই বেরিয়েছে। মুক্তধারা থেকে *কপোট্রনিক সুখ দুঃখ*, শিশু একাডেমী থেকে *দিপু নাম্বার টু*। *কপোট্রনিক সুখ দুঃখ* গল্পটি *বিচিত্রায়* ছাপা হয়েছিল এবং আজকের অনেক পাঠকই জানেন না, হুমায়ূন ভাইয়ের *নন্দিত নরকের* প্রথম সংস্করণের প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন দুজন শিল্পী—মুহম্মদ জাফর ইকবাল ও শামিম সিকদার।

হুমায়ূন আহমেদরা তিন ভাইই বিখ্যাত, তিন ভাইই লেখক। জনপ্রিয়তায় হুমায়ূন ভাইয়ের পরই জাফর ভাই। স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীদের কাছে মুহম্মদ জাফর ইকবালের মতো প্রিয় লেখক আর কেউ নেই। শিক্ষক হিসেবে দারুণ জনপ্রিয় তিনি। স্কুল-কলেজের মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের আদর্শ, অসম্ভব সাহসী এবং সৎমানুষ। যে কজন মানুষের আলোয় আলোকিত হয়ে আছে আমাদের সময়, মুহম্মদ জাফর ইকবাল তাঁদের একজন।

আর আহসান হাবীব *উন্মাদ* পত্রিকার সম্পাদক, দুর্দান্ত কার্টুন আঁকেন, রম্য লেখায় তাঁর তুলনা তিনি নিজেই। তাঁর জোকসের বইয়ের যে বিক্রি বইমেলায় আমি দেখেছি, বিস্ময়কর!

এই পরিবারের আরেকজন মানুষের আমি খুব ভক্ত, হুমায়ূন ভাইয়ের মা। সারা দিন বই পড়েন, সাহিত্য নিয়ে ভাবেন। *নূরজাহান* প্রথম পর্ব পড়ে আমাকে বললেন,

দ্বিতীয় পর্ব বেরোলে আমাকে দিয়ো। দ্বিতীয় পর্ব বেরোতে সাত বছর লাগল। এই সাত বছরে যতবার দেখা হয়েছে, ততবারই তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেছেন, বেরোয় নি ?

বই বেরোনোর পর প্রথম কপিটি আমি তাঁকে পৌঁছে দিয়ে এসেছি। শেষ পর্ব হুমায়ূন ভাই মাকে কিনে দিয়েছিলেন, বইটা পৌঁছে দিতে আমার কয়েকটা দিন দেরি হয়েছিল বলে।

আজিমপুরের সেই ফ্ল্যাট ছেড়ে হুমায়ূন ভাই তারপর এসে উঠলেন শহীদুল্লাহ হলের হাউস টিউটরের কোয়ার্টারে। তত দিনে অনিন্দ্য পাবলিশার্স নামের একটি প্রকাশনা সংস্থা বেশ জাঁকজমক করে এসেছে প্রকাশনায়। হুমায়ূন ভাইয়ের *অমানুষ*, আমার *কালাকাল*—এইসব বইনিয়ে শুরু করল। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই অনিন্দ্যর স্বত্বাধিকারী নাজমুল হক একদিন একটা মিষ্টির প্যাকেট আর একটা নতুন সাদা ডাইহাটসু গাড়ি নিয়ে হুমায়ূন ভাইয়ের বাড়িতে এসে হাজির। গাড়িটা আপনার জন্য। রয়ালটি থেকে অ্যাডজাস্ট হবে।

ঘটনাটি অবিশ্বাস্য। বাংলাদেশের কোনো লেখকের ক্ষেত্রে এ ধরনের ঘটনা আগে বা পরে আজ পর্যন্ত আর ঘটে নি।

সেই সময় *দৈনিক বাংলার* সাহিত্য পাতায় 'মৌনব্রত' নামে একটি ধারাবাহিক উপন্যাস লিখেছিলেন হুমায়ূন ভাই। ধারাবাহিকভাবে লেখা তাঁর বেশির ভাগ উপন্যাসই শেষ পর্যন্ত শেষ হয় না। 'মৌনব্রত'ও শেষ হলো না। পরে এই লেখাটি নাম বদলে বই করলেন তিনি। *জনম জনম*। উপন্যাসটি যাঁরা পড়েছেন তাঁরা স্বীকার করবেন, *জনম জনম* এক অসাধারণ উপন্যাস। পরে 'নিরন্তর' নামে আবু সায়িদ ছবি করেছেন। নায়িকা শাবনূর।

আমি হুমায়ূন আহমেদের প্রায় সব উপন্যাস পড়েছি। বহু ভালো উপন্যাস লিখেছেন তিনি। কতগুলোর নাম বলব! *নন্দিত নরকে* ও *শঙ্খনীল কারাগার*-এ দুটো উপন্যাস তো ইতিহাস! তারপর *নির্বাসন, সূর্যের দিন, অন্ধকারের গান, চাঁদের আলোয় কয়েকজন যুবক, গৌরিপুর জংশন, শ্রাবণ মেঘের দিন, কবি, উনিশ শো একাত্তর, ফেরা, জীবনকৃষ্ণ মেমোরিয়াল হাই স্কুল, আগুনের পরশমণি, কোথাও কেউ নেই, রুমালি, শুভ্র, লীলাবতী, মধ্যাহ্ন, জোছনা ও জননীর গল্প, মাতাল হাওয়া, বাদশা নামদার*—আরও কত উপন্যাস!

তাঁর লেখার একনিষ্ঠ পাঠক ও ভক্ত ছিলেন বাংলাদেশের খুব বড় একজন শিক্ষিত মানুষ, অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক। বেশ কয়েকবার হুমায়ূন ভাই আমাকে রাজ্জাক স্যারের ইউনিভার্সিটি কোয়ার্টারে নিয়ে গেছেন। মনে আছে, রাজ্জাক স্যার নিজ হাতে পাঙাস মাছের ডিম রান্না করে আমাদের দুজনকে একদিন খাইয়েছিলেন। তাঁর মুখে কী যে প্রশংসা শুনেছি হুমায়ুন ভাইয়ের একেকটি লেখার!

একবার বইমেলায় আবু হেনা মুস্তাফা কামাল বললেন, হুমায়ূন মধ্যবিত্তের নাড়ি স্পর্শ করেছে। তাঁর 'চোখ' গল্পটি পড়ে *সংবাদ*-এ দুর্দান্ত একটি লেখা লিখলেন সৈয়দ শামসুল হক। *চাঁদের আলোয় কয়েকজন যুবক* উপন্যাসটি পড়ে আহমদ ছফা আমাকে বলেছিলেন, অসাধারণ লেখা! মাত্র কয়েকটি আঁচড়ে বাংলাদেশের চেহারা ফুটিয়ে তুলেছে হুমায়ূন। ফরহাদ মযহার বলেছিলেন, হুমায়ূনের গল্পগুলোর কোনো তুলনা হয় না। নির্মলেন্দু গুণ মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন, তাঁর 'জলিল সাহেবের পিটিসন' গল্পটি পড়ে। কলকাতার *জিজ্ঞাসা* পত্রিকায় হুমায়ূন ভাইয়ের '১৯৭১' গল্পটি ছাপা হলো। আমার সামনে সেই গল্পের এমন প্রশংসা করলেন আল মাহমুদ, হুমায়ূন ভাই লজ্জা পেয়ে গেলেন।

এ রকম কত ঘটনার কথা লিখব!

একই হাতে কত রকমের লেখা যে লিখেছেন হুমায়ূন ভাই। বাংলা ভাষায় সায়েন্স ফিকশনের জনক তিনি। প্রথম সার্থক সায়েন্স ফিকশন লিখেছেন, সায়েন্স ফিকশনকে জনপ্রিয় করেছেন। এখন তাঁর অনুজ মুহম্মদ জাফর ইকবালের সায়েন্স ফিকশনও ভীষণ জনপ্রিয়।

ভূতের গল্পে হুমায়ূন আহমেদের কোনো জুড়ি নেই। তাঁর মতো এত ভালো ভূতের গল্প বাংলা ভাষার আর কোনো লেখক লেখেন নি। এই মুহূর্তে মনে পড়ছে 'ছায়াসঙ্গী' গল্পটির কথা। রহস্য, ফ্যান্টাসি, থ্রিলার আর অদ্ভুত অদ্ভুত বিষয়ের লেখা।

দেবী, নিশীথিনী লিখে আরেকটা জগৎ তৈরি করলেন। *অন্য ভুবন* লিখে আরেকটি জগৎ তৈরি করলেন। *আয়নাঘর, পোকা, ভয়*—কত লেখার কথা বলব! আর তাঁর সেই অবিস্মরণীয় চরিত্র মিসির আলী, তুমুল জনপ্রিয় চরিত্র হিমু!

সিলেটের একটি মেয়ে-হিমুর সঙ্গেও আমার একবার দেখা হয়েছিল।

সব মিলিয়ে হুমায়ূন আহমেদ একটি নেশার নাম, হুমায়ূন আহমেদ একটি প্রতিষ্ঠান।

শিশু-কিশোরদের লেখা, রূপকথা—কোথায় তাঁর হাতের পরশ পড়ে নি? আর যেখানে পড়েছে, সেখানেই সোনা ফলেছে।

বাংলা ভাষায় তাঁর প্রিয় লেখক রবীন্দ্রনাথ। ঘণ্টার পর ঘণ্টা রবীন্দ্রনাথের কবিতা মুখস্থ বলে যেতে পারেন। বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর, মানিক, সতীনাথ ভাদুড়ীর উপন্যাস-গল্প তাঁর প্রিয়। জন স্টাইনবেক, স্টিফান কিং তাঁর প্রিয়। সারাক্ষণ লেখা নিয়ে ভাবছেন। লেখার ব্যাপারে অসম্ভব খুঁতখুঁতে। মনমতো না হলে সেই লেখা কিছুতেই লিখবেন না। মাথা ভর্তি নতুন নতুন আইডিয়া। সবার মধ্যে থেকেও, তুমুল আড্ডার মধ্যে থেকেও কোন ফাঁকে যেন একা হয়ে যান, লেখার জগতে চলে যান। যখন-তখন লিখতে পারেন। লেখেন মেঝেতে বসে, লেখার জন্য চেয়ার-টেবিল দরকার হয় না। লেখার মতোই অসম্ভব আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে গল্প বলতে পারেন, বাস্তবের সঙ্গে কোথায় যে মিশেল দেবেন কল্পনা, তিনি নিজে ছাড়া কেউ তা বুঝতে পারবে না। কখনো তিনি নিজেই মিসির আলী, কখনো হিমু।

সব মিলিয়ে এক বিস্ময়কর মানুষ।

কাউকে মা-বাবা ডাকতে পারেন না। নিজের শ্বশুর-শাশুড়িকেও কখনো মা কিংবা বাবা বলে ডাকেন না। কাউকে দুঃখ দিতে চাইলে বেশ ভালোভাবেই তা দিতে পারেন।

নিজের নাটকে একবার এক বিশাল নাট্যব্যক্তিত্বের অভিনয় দেখে এত বিরক্ত হলেন, বললেন, 'এটা কি অভিনয় ? আরে, আপনি তো অভিনয়ই জানেন না।'

একবার তাঁর নুহাশপল্লীতে নাটকের রেকর্ডিংয়ে এসে সন্ধ্যার পর কয়েকজন অভিনেতা-অভিনেত্রী অন্য একটি ঘরে বসে হুমায়ূন আহমেদের তুমুল নিন্দামন্দ করছেন। তিনি তো আর তা জানেন না, খুবই উৎফুল্ল ভঙ্গিতে সেই ঘরের দিকে যাচ্ছেন। ঘরের কাছে গিয়েই শোনেন, এই অবস্থা। বাইরে দাঁড়িয়ে খানিক ওসব শুনে মন খারাপ করে ফিরে এলেন। সেইসব অভিনেতা-অভিনেত্রীকে বুঝতে দিলেন না কিছু। আবার পেটে কথাও রাখতে পারেন না। যদি বন্ধুদের কেউ কোনো গোপন কথা বলে বলল, কাউকে বলবেন না, সেটাই সবার আগে বলে ফেলবেন। পাগলের সাঁকো নাড়ানোর মতো।

৪

হুমায়ূন আহমেদের ভালো ছাত্র হয়ে ওঠার গল্পটা বলি।

গল্প না, ঘটনা। গল্পে কল্পনা থাকে, ঘটনায় থাকে সত্যতা। ছেলেবেলায় পড়াশোনায় খুবই খারাপ ছিলেন তিনি। আসলে পড়াশোনায় তাঁর মন বসত না। একেবারেই মনোযোগী ছিলেন না লেখাপড়ায়। স্কুলের পরীক্ষাগুলোয় টেনেটুনে, কায়ক্লেশে পাসটা করতেন।

বাবার বদলির চাকরি। একেকবার একেক জেলায়। চিটাগাং কলেজিয়েট স্কুলে ক্লাস সিক্সে পড়ছেন। সে বছর পাসই করতে পারলেন না। ডাহা ফেল। ফেল করা মুখ নিয়ে বাড়ি ফিরবেন কী করে! ক্লাস টিচার বড়ুয়া স্যার। তাঁর কাছে গিয়ে কান্নাকাটি শুরু করলেন। ছাত্রের কান্না দেখে বড়ুয়া স্যারের হৃদয় দ্রবীভূত হলো। তিনি বিশেষ বিবেচনায় ক্লাস সেভেনে তুলে দিলেন। ওপরের ক্লাসে উঠে যেই কে সেই! অবস্থা আগের মতোই। পড়ায় মন বসে না।

মন বসল ক্লাস এইটে ওঠার পর।

স্কুল থেকে তখন খুবই সুস্বাদু, ভালো টিফিন দেওয়া হতো। সেই টিফিনের জন্য ব্যাপক লোভ ছিল বালক হুমায়ূন আহমেদের। এখানে ব্র্যাকেটে আরেকটা কথা বলে রাখি। হুমায়ূন আহমেদের ডাকনাম 'বাচ্চু'। কবি শামসুর রাহমানেরও ডাকনাম ছিল 'বাচ্চু'। পরে দুজনের কেউ এই নাম কখনো ব্যবহার করেন নি। কাউকে বলতেনও না।

যা হোক, ক্লাস এইটে বৃত্তি পরীক্ষা হবে। ক্লাসের ভালো ছাত্রদের সিলেক্ট করা হয়েছে বৃত্তি পরীক্ষার জন্য। যারা সিলেক্ট হয়েছে, স্কুলে তাদের মহাসমাদর। স্যাররা

খাতির করছেন, ছাত্ররা খাতির করছে। তাদের যত্ন-আত্তির অভাব নেই। যেহেতু বৃত্তি পরীক্ষা দিতে হবে, সেহেতু ফাইনাল পরীক্ষাও তাদের দিতে হবে না। আর যেটা সবচেয়ে আকর্ষণীয় ঘটনা সেটা হলো, ভালো ছাত্রদের টিফিন দেওয়া হবে ডাবল। সাধারণ ছাত্ররা যে টিফিন পাবে, ওরা পাবে তার দ্বিগুণ।

এই টিফিনের লোভটা ঢুকল হুমায়ূন আহমেদের মাথায়। যেমন করে হোক বৃত্তি পরীক্ষা তাঁকে দিতেই হবে। বৃত্তি পরীক্ষায় সিলেক্ট হলেই ডাবল টিফিন। তিনি ক্লাস টিচারের কাছে গিয়ে, হুমায়ূন আহমেদের ভাষায়, 'ঘ্যানরঘ্যানর শুরু করলাম। রোজই স্যারকে ধরি আর করুণ মুখ করে কাঁদো কাঁদো গলায় বলি, স্যার, আমি বৃত্তি পরীক্ষা দেব।'

প্রথম দিন ক্লাসের খারাপ ছাত্রগুলোর একটি বৃত্তি পরীক্ষা দিতে চাইছে শুনে স্যার আকাশ থেকে পড়লেন। 'বলিস কী, তুই দিবি বৃত্তি পরীক্ষা!'

জি স্যার।

আরে তুই তো ক্লাস সিক্সে ফেল করেছিলি। সেভেন থেকে এইটে উঠেছিস তাও দুটো না তিনটে সাবজেক্টে ফেল।

তাও আমি স্যার বৃত্তি পরীক্ষা দেব।

যা যা ভাগ।

স্যার ধমক দিয়ে বিদায় করলেন।

পরদিন আবার সেই ঘ্যানঘ্যানানি, 'স্যার, আমি বৃত্তি পরীক্ষা দেব।'

আজ স্যার বিরক্ত হলেন আরও বেশি। পারলে মেরে ক্লাস থেকে বের করে দেন। হুমায়ূন আহমেদের করুণ কাঁদো কাঁদো মুখ দেখে মারলেন না। আগের দিনের মতোই ধমক দিয়ে থামালেন।

কিন্তু হুমায়ূন আহমেদ থামার জিনিস না। চান্স পেলেই স্যারকে ধরছেন, 'আমি বৃত্তি পরীক্ষা দেব, স্যার। আপনি ব্যবস্থা করে দিন।'

একই ঘ্যানঘ্যানানি রোজ শুনতে শুনতে স্যার একদিন মহা বিরক্ত হয়ে বললেন, 'আয় আমার সঙ্গে।'

নিয়ে গেলেন হেডস্যারের রুমে, 'স্যার, এই ছেলেটা বৃত্তি পরীক্ষা দিতে চায়।'

হেডস্যার অবাক, 'বলেন কী!'

জি স্যার।

আরে ও তো সব সাবজেক্টে পাসই করতে পারে না, ও কী বৃত্তি পরীক্ষা দেবে? স্কুলের মান-ইজ্জত থাকবে না।

সারা জীবনই হুমায়ূন আহমেদের সঙ্গে বিচিত্র সব মানুষের দেখা হয়েছে। ওই স্যারটিও কিঞ্চিৎ বিচিত্র চরিত্রেরই ছিলেন। হেডস্যারকে বললেন, 'তার পরও আপনি স্যার ওকে কনসিডার করেন। দেখা যাক কী হয়।'

সেই শিক্ষকের নাম আমার মনে পড়ছে না। হুমায়ূন ভাই বলেছিলেন, ভুলে গেছি। স্মৃতি আজকাল কিছুটা প্রতারণাও করছে।

তো, ক্লাস টিচারের কথা শুনে হেডস্যার হতভম্ব, 'এসব আপনি কী বলছেন? এটা কী করে সম্ভব? স্কুলের মান-ইজ্জত সব যাবে।'

শেষ পর্যন্ত ওই স্যারের কারণেই হেডস্যার কনসিডার করলেন। ক্লাস এইটের একটি খারাপ ছাত্রও বৃত্তি পরীক্ষা দেবে এমন ঘটনা চিটাগাং কলেজিয়েট স্কুলে কখনো ঘটে নি।

হুমায়ূন আহমেদ দারুণ খুশি। আরে, কিসের বৃত্তি পরীক্ষা, টিফিন ডাবল পাওয়া যাবে এটাই হচ্ছে আসল ঘটনা।

পরদিন থেকে ভালো ছাত্রদের মতো ডাবল টিফিন পেতে লাগলেন। কিন্তু কপাল খারাপ, চার-পাঁচ দিনের মাথায় জলবসন্ত হয়ে গেল। জলবসন্ত নিয়ে স্কুলে যাওয়া যায় না, বাড়িতে শুয়ে থাকতে হয়। রাতের বেলা তো বটেই, দিনের বেলাও মশারি টানিয়ে রাখতে হয়। মাথার কাছে নিমের একটা ডাল রাখা হয়েছে। ডাল ভর্তি পাতা। নিমপাতা জলবসন্তের মহৌষধ। শরীর অবিরাম চুলকায়। তখন নিমপাতা শরীরে বুলিয়ে দিলে আরাম হয়।

কিন্তু মশারির তলার জীবন লেখকের ভালো লাগে না। ভাইবোনরা কেউ তাঁর সামনে আসেই না। জলবসন্ত ছোঁয়াচে রোগ। কাছে এলেই বা ছুঁলেই হবে। বাবা চাকরি নিয়ে ব্যস্ত, মা সংসার নিয়ে। বালক হুমায়ূন আহমেদ মশারির তলায় একা একা ছটফট করেন। সময় আর কাটে না। ওদিকে বৃত্তি পরীক্ষার মাস দেড়-দুয়েক বাকি।

একদিন মনে হলো, আচ্ছা, ক্লাসের বইগুলো একটু পড়ে দেখি তো! কিছু হোক আর না হোক, সময়টা তো কাটবে।

জলবসন্ত ভরা শরীরে মশারির তলায় সময় কাটানোর জন্য ক্লাসের বইগুলো পড়তে শুরু করলেন, অঙ্কগুলো একা একাই করতে লাগলেন। লেখাপড়ার আশ্চর্য এক নেশা ধরে গেল। ধীরে ধীরে জলবসন্ত সারল। বৃত্তি পরীক্ষার দিন এসে গেল। পরীক্ষা দিলেন। ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি পেলেন। স্কুলের ভালো ছাত্র যারা তাঁর সঙ্গে পরীক্ষা দিয়েছিল, তারা কেউ তাঁর ধারেকাছেও নেই। সবাইকে পেছনে ফেলে হুমায়ূন আহমেদ নাম্বার ওয়ান!

শুরু হলো হুমায়ূন আহমেদের ভালো ছাত্রের জীবন। এসএসসিতে স্ট্যান্ড করলেন, এইচএসসিতে স্ট্যান্ড করলেন। ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে কেমিস্ট্রিতে ভর্তি হলেন, তুখোড় রেজাল্ট। ডক্টরেট করতে গেলেন আমেরিকার নর্থ ডাকোটা ইউনিভার্সিটিতে। অলঞ্চ এ ক্যাটাগরির স্টুডেন্ট। শিক্ষকতার জীবন শুরু করলেন ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে। তারপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার। অধ্যাপক হয়ে ডক্টর হুমায়ূন আহমেদ শিক্ষকতা ছেড়ে দিলেন। তত দিনে সাহিত্যজগতে তিনি কিংবদন্তি হয়ে গেছেন।

কিন্তু ক্লাসের খারাপ ছাত্রটি বৃত্তি পরীক্ষায় সবচেয়ে ভালো করেছে, স্কুলে হৈচৈ পড়ে গেছে। সেই টিচার পারলে হুমায়ূন আহমেদকে কোলে নিয়ে হেডস্যারের রুমে চলে যান। ছাত্রের ভালো রেজাল্টের গৌরবে স্কুলে তাঁর পজিশনও হাই হয়ে গেছে।

ক্লাস নাইনে ঘটল আরেক ঘটনা।

জেনারেল ম্যাথের টিচার হুমায়ূন আহমেদের খাতা দেখতে দেখতে এতটাই মুগ্ধ হয়ে গেছেন, ১০০ নম্বরের জায়গায় ১১০ নম্বর দিয়ে দিয়েছেন।

হেডস্যার অঙ্কের টিচারকে ডেকে পাঠালেন। এটা আপনি কী করেছেন ? ১০০ নম্বরের জায়গায় ১১০ ? অঙ্কের টিচার খেপে গেলেন। ছেলেটা অঙ্কে এত ভালো, আমার ইচ্ছা আমি তাকে ১০০-র মধ্যে ১১০ দিয়েছি। আপনার কোনো অসুবিধা আছে ?

হেডস্যার হতভম্ব। এ দেখি অদ্ভুত চরিত্র!

নিশ্চয় জীবনের এসব অভিজ্ঞতা থেকেই হুমায়ূন আহমেদ উপন্যাস-গল্প-নাটকে অদ্ভুত সব চরিত্রের সমাবেশ ঘটান। তাঁর অভিজ্ঞতা এবং দেখার ভঙ্গি অন্য কারও সঙ্গে মেলে না।

এসব ঘটনা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন আড্ডায় হুমায়ূন ভাই মজা করে বলেছেন। আমি আমার স্মৃতি থেকে লিখছি।

হুমায়ূন ভাইয়ের ভয় পাওয়া নিয়ে এবার নিজের একটা অভিজ্ঞতার কথা বলি।

১৯৮৫-৮৬ সালের কথা। বিটিভিতে চলছে হুমায়ূন আহমেদের দেশ-কাঁপানো ধারাবাহিক 'এইসব দিনরাত্রি'। প্রযোজক মুস্তাফিজুর রহমান। সেই নাটক নিয়ে চারদিকে চলছে তুমুল আলোচনা। নাটকের ছোট্ট মেয়ে টুনি, তার ব্লাড ক্যান্সার। দর্শক আতঙ্কে আছে টুনির মৃত্যু নিয়ে। ওই প্রথম বাংলাদেশ টেলিভিশনের কোনো ধারাবাহিক নিয়ে দৈনিক পত্রিকায় পোস্ট এডিটরিয়াল পর্যন্ত লেখা হলো। টুনিকে যেন মেরে ফেলা না হয়। কোনো কোনো সাপ্তাহিক পত্রিকা কাভার স্টোরি করেছে।

নাটক যখন তুঙ্গে, তখন এক সন্ধ্যায় আমাকে নিয়ে হুমায়ূন ভাই গেছেন মুস্তাফিজ ভাইয়ের ফ্ল্যাটে। তিনি তখন নিউমার্কেটের দক্ষিণ দিককার সরকারি কোয়ার্টারে থাকেন। প্রায়ই আমাকে নিয়ে হুমায়ূন ভাই তাঁর ফ্ল্যাটে যান। খাওয়াদাওয়া, গল্প-আড্ডা আর নাটক নিয়ে নানা ধরনের আলাপ-আলোচনা। আড্ডা শেষ করে হুমায়ূন ভাই ফিরে যান তাঁর আজিমপুরের বাসায়, আমি চলে যাই গেণ্ডারিয়ায়।

ও রকম এক সন্ধ্যার ঘটনা।

সিঁড়ি ভেঙে আমরা দুজন মুস্তাফিজ ভাইয়ের ফ্ল্যাটের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছি। সরকারি পুরনো আমলের ফ্ল্যাট। দরজাগুলো পুরনো। দরজার মাথার ওপর পুরনো আমলের কলিংবেলের সুইচ। সিঁড়িতে টিমটিম করে জ্বলছে অল্প পাওয়ারের একটা বাল্ব। হুমায়ূন ভাই আনমনা ভঙ্গিতে কলিংবেলের সুইচে হাত দিতে গিয়েই 'উরে বাবা রে' বলে একলাফে সরে এলেন।

আমি কিছুই বুঝতে পারি নি। ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেলাম। প্রথমে মনে হলো পুরনো কলিংবেল, তারফারে লিকটিক হয়ে আছে কি না! হুমায়ূন ভাই কি ইলেকট্রিক শক খেলেন।

খুবই নার্ভাস ভঙ্গিতে তাঁর হাত ধরলাম। কী হলো, হুমায়ূন ভাই?

তিনি কোনোরকমে বললেন, মাকড়সা।

মাকড়সা?

হ্যাঁ।

তিনি রীতিমতো কাঁপছেন। তাকিয়ে দেখি, কলিংবেলের সুইচের ওখানে মাঝারি সাইজের একটা মাকড়সা।

মাকড়সাকে এ রকম ভয়?

সত্যি তা-ই। হুমায়ূন ভাই সবচেয়ে ভয় পান মাকড়সা। তাঁর ভাইবোনরাও কেউ কেউ মাকড়সাকে খুবই ভয় পান।

সেদিন মাকড়সার ভয়ে মুস্তাফিজ ভাইয়ের ফ্ল্যাটে তিনি আর স্বাভাবিকই হতে পারলেন না। দ্রুত আড্ডা শেষ করে আমরা ফিরে এলাম।

আমরা তখন প্রায়ই বাংলাবাজারে পাবলিশার্সদের ওখানে গিয়ে চা-বিস্কুট খাই আর আড্ডা দিই। রয়ালটির টাকাপয়সার জন্যও যাই কোনো কোনো দিন। আমার অবস্থা তখন খুবই খারাপ। হুমায়ূন ভাই ইউনিভার্সিটির টিচার। তাঁর একটা বাঁধা রোজগার আছে। আমার নেই কিছুই। হুমায়ূন ভাইয়ের কাছ থেকে পঞ্চাশ-একশ টাকা ধারও নিই। সেই ধার কোনোদিন শোধ করি না।

একদিন দুপুরের দিকে বাংলাবাজার থেকে রিকশায় করে যাচ্ছি তাঁর শহীদুল্লাহ হলের কোয়ার্টারে। বাহাদুর শাহ্ পার্কের ওখানে দেখি এক পাখিওয়ালা খাঁচায় করে মুনিয়া পাখি বিক্রি করছে। আমরা রয়ালটির কিছু টাকা পেয়েছি। খাঁচাসহ হুমায়ূন ভাই তিন জোড়া মুনিয়া পাখি কিনে ফেললেন।

ঢাকায় তখন ট্রাফিক জ্যাম বলতে কিচ্ছু নেই। আমরা রিকশায় করে ইউনিভার্সিটি এলাকার দিকে যাচ্ছি। যেতে যেতে দুজনে মিলে একটা বিজনেসের প্ল্যান করে ফেললাম।

আমাদের সেই ব্যবসার প্ল্যান ইত্যাদির কথা পরে বলব।

৫

ভোরের কাগজ-এর সাহিত্য পাতায় হুমায়ূন আহমেদ ধারাবাহিকভাবে লিখতে শুরু করেছিলেন তাঁর মনোজগৎ আচ্ছন্ন করে থাকা মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস 'জোছনা ও জননীর গল্প'।

অনেক বছর আগের কথা।

হুমায়ূন আহমেদ তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। বিশাল ক্যানভাসের উপন্যাসটি লেখার জন্য স্ত্রী আরও কয়েক বছর আগে তাঁকে ৫০০ পৃষ্ঠার একটি খাতা উপহার দিয়েছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এক বছরের ছুটি নিয়ে 'জোছনা ও জননীর গল্প' লিখতে শুরু করেন হুমায়ূন আহমেদ। কিন্তু কয়েক কিস্তি লিখে লেখা বন্ধ করে দেন। 'নীলগঞ্জ হাই স্কুলের আরবি শিক্ষক মাওলানা ইরতাজউদ্দিন কাশেমপুরী কমলাপুর রেলস্টেশনে দাঁড়িয়ে আছেন।' এই লাইনটি দিয়ে উপন্যাস শুরু হয়ে কিছুদূর এগোয়, তারপর আর খবর নেই। লেখা বন্ধ।

পত্রিকার সম্পাদক একটু ফাঁপরে পড়েন। তারপর কিছুদিনের গ্যাপে আবার শুরু হয় লেখা, কয়েক কিস্তির পর আবার বন্ধ। ঈদসংখ্যার লেখা, বইমেলার লেখা, নাটক, সিনেমা—সবই লিখছেন হুমায়ূন আহমেদ, শুধু 'জোছনা ও জননীর গল্প' লিখছেন না।

কেন?

তাঁর লাখ লাখ পাঠকের মতো আমার মনেও প্রশ্নটি ঘুরঘুর করে। দুইবারে লেখা কয়েক কিস্তি পড়ে অস্থির হয়ে আছি। কবে শেষ হবে এই উপন্যাস? কবে পুরোটা পড়া যাবে? দেখা হলে জিজ্ঞেস করি। তিনি তাঁর স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে মজা করেন। 'জোছনা ও জননীর গল্প' প্রসঙ্গ এড়িয়ে যান। সময় কাটে সময়ের মতো। হৃদয়ে দুর্যোগ নামে লেখকের। সিঙ্গাপুরে গিয়ে বাইপাস করান। অপারেশন থিয়েটারে যাওয়ার আগমুহূর্তে, অ্যানেসথেশিয়ার কল্যাণে অবচেতন হওয়ার মুহূর্তে তাঁর মনে পড়ে, একটি কাজ বাকি রয়ে গেল, 'জোছনা ও জননীর গল্প' লেখা। মাতৃভূমির ঋণ শোধ করা হলো না।

ফিরে এসে লেখা শুরু করেন।

এবার আর কিস্তি কিস্তি নয়, কোনো পত্রিকায় ধারাবাহিক নয়, সরাসরি লেখা শেষ করা, বই বের করা। পরম করুণাময়কে ধন্যবাদ যে এবার আর তিনি থেমে যান নি, লেখা শেষ করেছেন।

২০০৪ সালের কথা। *জোছনা ও জননীর গল্প* এখন পাঠকের হাতে হাতে। বাংলা একাডেমী বইমেলার মাঝামাঝি সময়ে প্রকাশিত হয়েছে বইটি। ৪০০ টাকা দামের বইটির চার-পাঁচটি সংস্করণ হয়ে গেছে সপ্তাহখানেকের মধ্যে। প্রকাশক অন্যপ্রকাশ।

বইমেলায় অন্যপ্রকাশের স্টলে *জোছনা ও জননীর গল্প*-র জন্য দীর্ঘ লাইন ধরতে দেখেছি পাঠককে। কোনো কোনো দিন বাঁধাইয়ের কারণে বই থাকত না স্টলে। ইস্, সে সময় যে কী হাহাকার পাঠকের! এসব দৃশ্য চোখে না দেখলে বোঝা যাবে না। একজন লেখক যে কী ধরনের জাদুকরী প্রভাব বিস্তার করতে পারেন পাঠকের মনে, হুমায়ূন আহমেদ তার একমাত্র উদাহরণ। বাংলা ভাষার কোনো লেখকের ক্ষেত্রে এ রকম ঘটে নি।

হুমায়ূন আহমেদের পাঠকরা জানেন, লেখায় এক ধরনের ঘোর তৈরি করেন তিনি, এক ধরনের মায়া বিস্তার করেন। একবার তাঁর লেখার ভেতর ঢোকার অর্থ হচ্ছে, সেই মায়ার জগতে বন্দি হওয়া। পড়া শেষ হওয়ার পরও ঘোর সহজে কাটতে চায় না। পাঠক আচ্ছন্ন থাকে অনেক দিন।

জোছনা ও জননীর গল্প পড়ে এখনো আচ্ছন্ন হয়ে আছি আমি।

তবে লেখায় শুধু যে পাঠককেই আচ্ছন্ন করেন হুমায়ূন আহমেদ তা নয়, তিনি নিজেও আচ্ছন্ন হন। লেখার সময় তাঁর নিজের মধ্যেও তৈরি হয় আশ্চর্য রকমের এক ঘোর। *জোছনা ও জননীর গল্প* লেখার সময় তাঁকে এ রকম ঘোরে পড়তে দেখেছি আমি। দিনভর মাথা নিচু করে লিখছেন, চা খাচ্ছেন, সিগারেট খাচ্ছেন, প্রুফ দেখছেন, লেখা বদলাচ্ছেন, কাটাকাটি করছেন আর পড়ছেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বাংলা-ইংরেজিতে লেখা হেন বই নেই, হেন পত্রপত্রিকা নেই, যা না পড়েছেন।

সন্ধ্যার পর সাধারণত লেখেন না তিনি, বন্ধুবান্ধব নিয়ে আড্ডা দেন। সেই আড্ডার সময়ও লক্ষ করেছি, সবার সঙ্গে থেকেও কোন ফাঁকে তিনি যেন একা হয়ে গেছেন। তাঁর মন চলে গেছে উনিশ শ একাত্তরে। মনে মনে *জোছনা ও জননীর গল্পের* পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলো সাজাচ্ছেন তিনি। নিজের মধ্যে প্রবল ঘোর তৈরি না হলে তিন-চার মাসের মধ্যে ৪৯৩ পৃষ্ঠার এ রকম একটি মহৎ উপন্যাস লিখে শেষ করা যায় না। সঙ্গে আছে ছয় পৃষ্ঠার চমৎকার একটি ভূমিকা। আর ব্যাপক পড়াশোনার কথা তো আগেই বললাম।

এতক্ষণে পাঠক সংগত কারণেই আশা করবেন, উপন্যাসটির ভালো-মন্দ নিয়ে আমি কিছু কথা বলব, কিছু সমালোচনা করব, উপন্যাসটির দোষ-ত্রুটি ধরব, অমুক জায়গায় তমুক হলে ভালো হতো, ওই চরিত্রটি যেন হঠাৎই শেষ হয়ে গেছে, অমুক অমুক তথ্যে গণ্ডগোল আছে ইত্যাদি। সবিনয়ে বলি, ওটি আমার কাজ নয়। ওই কাজটি করবেন গবেষক-সমালোচকরা। আমি গবেষক কিংবা সমালোচক নই। যদিও *জোছনা ও জননীর গল্প*-র পূর্বকথায় ব্যাপারটি পরিষ্কার করে দিয়েছেন হুমায়ূন আহমেদ।

> *জোছনা ও জননীর গল্প* কোনো ইতিহাসের বই নয়, এটি একটি উপন্যাস। তার পরও ইতিহাসের খুব কাছাকাছি থাকার চেষ্টা আমি করেছি। সেখানেও ভুলভ্রান্তি হতে পারে। হওয়াটা স্বাভাবিক। উপন্যাস যেহেতু কোনো আসমানি কিতাব নয়, এসব ভুলভ্রান্তি দূর করার উপায় আছে।
>
> উপন্যাসে চরিত্র হিসেবে সেই সময়ের অতি গুরুত্বপূর্ণ কিছু মানুষ এনেছি। এই স্বাধীনতা একজন ঔপন্যাসিকের আছে। গুরুত্বপূর্ণ মানুষদের চরিত্র ফুটিয়ে তোলায় কোনো ভুল যদি করে থাকি, তার জন্য আগেভাগেই ক্ষমা চাচ্ছি। অতি বিনয়ের

সঙ্গে সেই বিখ্যাত উক্তি মনে করিয়ে দিচ্ছি—একজন লেখক যা লিখবেন সেটাই সত্যি।

'সেই সত্য যা রচিবে তুমি, ঘটে যা তা সব সত্য নহে।

কবি, তব মনোভূমি রামের জনম স্থান, অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।'

উপন্যাসে বর্ণিত প্রায় সব ঘটনাই সত্য। কিছু নিজের অভিজ্ঞতা থেকে লেখা, কিছু অন্যের অভিজ্ঞতা থেকে ধার নেওয়া। প্রকাশিত হওয়ার আগেই এ উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি অনেককে পড়িয়েছি। যারা মুক্তিযুদ্ধ দেখে নি (এই প্রজন্মের পাঠকের কথা বলছি), তারা পড়ার পর বলেছে, উপন্যাসের অনেক ঘটনাই তাদের কাছে কাল্পনিক বলে মনে হচ্ছে, এ রকমও কি হয়?

তদের কাছে আমার একটাই কথা, 'সে বড় অদ্ভুত সময় ছিল। স্বপ্ন ও দুঃস্বপ্নের মিশ্র এক জগৎ—সবই বাস্তব আবার সবই অবাস্তব। আমি সেই ভয়ংকর সুন্দর সুররিয়েলিস্টিক সময় পার করে এসেছি। তার খানিকটাও যদি ধরে থাকতে পারি, তাহলেই আমার মানবজীবন ধন্য।

খানিকটা নয়, প্রিয় হুমায়ূন আহমেদ, আপনি প্রায় সবখানিই ধরেছেন। *জোছনা ও জননীর গল্প* লিখে আপনি আপনার লেখকজীবন পূর্ণ করেছেন। এ রকম একটি উপন্যাস লেখার পর একজন লেখকের আর কিছু চাওয়ার থাকে না।

হুমায়ূন আহমেদের অন্যান্য লেখার সঙ্গে *জোছনা ও জননীর গল্প* একেবারেই মেলে না। এ একেবারেই অন্য ধাঁচের রচনা। অতি সরল এবং আশ্চর্য রকমের নিরাসক্ত, ঘরোয়া ভাষায় পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা লিখে গেছেন তিনি। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ—এই তিনটি কালকে কখন যে একাকার করে দিয়েছেন গল্পের ভেতর, কখন যে পাঠককে নিয়ে গেছেন স্বপ্নে, কখন ফিরিয়ে এনেছেন বাস্তবে—টেরই পাওয়া যায় না। উপন্যাস রচনার কোনো প্রচলিত রীতি তিনি মানেনই নি। যেভাবে লিখে আনন্দ পেয়েছেন, যেভাবে পাঠককে বোঝাতে পেরেছেন—গল্প সেভাবেই এগিয়ে নিয়ে গেছেন। যেখানে যে তথ্যের প্রয়োজন, নির্বিকারভাবে তা ব্যবহার করেছেন, ফুটনোটে উল্লেখ করেছেন তথ্যসূত্র। কোথাও কোথাও মুক্তিযুদ্ধের দলিল প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা তুলে দিয়েছেন। অর্থাৎ যখন যেখানে যা প্রয়োজন, যেমন করে সাজালে উপন্যাসটি পূর্ণাঙ্গ হবে তা-ই করেছেন। বহু টুকরোটাকরা গল্প, ঘটনা, চরিত্র আর ইতিহাসের উপাদানকে মহৎ শিল্পীর ভঙ্গিতে জোড়া দিয়ে দিয়ে যে সময়কে তিনি সম্পূর্ণ তুলে ধরেছেন, সেই সময়ের নাম উনিশ শ একাত্তর। ফলে এই উপন্যাস একাধারে আমাদের সবচেয়ে গৌরবময় সময়ের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস এবং মূল্যবান

দলিলও। হুমায়ূন আহমেদ শুধু উপন্যাসই লেখেন নি, মুক্তিযুদ্ধের সত্যিকার ইতিহাস লেখার মহৎ দায়িত্বটিও পালন করেছেন।

এই উপন্যাসে চরিত্র হয়ে এসেছেন মওলানা ভাসানী, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান, বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী, ইন্দিরা গান্ধী, ইয়াহিয়া খান, ভুট্টো, টিক্কা খান, অর্থাৎ সেই সময়কার সব শ্রদ্ধেয় ও নিন্দিত মানুষ। ভারতীয় বাহিনীর চরিত্ররা এসেছেন যে যাঁর ভূমিকায়। মুক্তিযোদ্ধারা এসেছেন, রাজাকাররা এসেছে, শর্ষিনার পীর সাহেব এসেছেন, আর এসেছে সারা দেশের নানা স্তরের নানা রকম মানুষ। ছোট, বড় এবং ঐতিহাসিক এত চরিত্রের সমাহার আর কোনো বাংলা উপন্যাসে এভাবে এসেছে কি না, এত সার্থকভাবে চরিত্রগুলো ফুটিয়ে তোলা হয়েছে কি না আমার জানা নেই।

আজকের দুই নেত্রীর সেই সময়কার অবস্থার কথা এসেছে, শেখ জামালের কথা এসেছে, শেখ হাসিনার ছেলে জয়ের জন্মের কথা এসেছে। এত সহজ ও সাবলীলভাবে এসেছে, পড়ে পাঠকের মনে হবে, আরে এইসব মানুষের কথা এভাবেও লেখা যায়!

> ইরতাজউদ্দিন তখন মওলানা সাহেবকে চিনলেন—ইনি মওলানা ভাসানী! পত্রিকায় কত ছবি দেখেছেন। এই প্রথম সামনাসামনি দেখা।
>
> ইরতাজউদ্দিন তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে সালাম দিলেন। মওলানা ভাসানী তাঁর দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বললেন, 'ঘুম ভালো হয়েছে?' যেন কত দিনের চেনা মানুষ।
>
> ইরতাজউদ্দিন বিনয়ের সঙ্গে বললেন, 'জি।'
>
> 'আপনার ঘুমের ব্যাঘাত করেছি, কিছু মনে করবেন না।'
>
> ইরতাজউদ্দিন আরও লজ্জার মধ্যে পড়ে গেছেন। এ রকম একজন বিখ্যাত মানুষের সামনে ইজিচেয়ারে শুয়ে থাকা যায় না। তিনি উঠে দাঁড়ালেন।

এই ইরতাজউদ্দিন হুমায়ূন আহমেদের এক অবিস্মরণীয় সৃষ্টি। পরাধীন দেশে জুমার নামাজ হয় না, জুমার নামাজ পড়াতে অস্বীকৃতি জানান তিনি। এ কারণে ক্যাপ্টেন বাসেত তাঁকে নীলগঞ্জ স্কুল এবং বাজারে সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় প্রদক্ষিণ করায়।

> বাজারে ছোট্ট একটা ঘটনা ঘটল। দরজির দোকানের এক দরজি একটা চাদর নিয়ে ছুটে এসে ইরতাজউদ্দিনকে ঢেকে দিয়ে জড়িয়ে ধরে থাকল। ঘটনা এতই দ্রুত ঘটল যে সঙ্গের মিলিটারিরা বাধা দেবার সময় পেল না।

ইরতাজউদ্দিন এবং দরজিকে মাগরেবের নামাজের পর সোহাগী নদীর পাড়ে নিয়ে গুলি করা হলো। মৃত্যুর আগে আগে ইরতাজউদ্দিন পরম নির্ভরতার সঙ্গে আল্লাহপাকের কাছে উঁচু গলায় শেষ প্রার্থনা করলেন, 'হে আল্লাহপাক, যে মানুষটা জীবনের মায়া তুচ্ছ করে আমাকে লজ্জার হাত থেকে বাঁচাতে চেয়েছিল, তুমি তার প্রতি দয়া করো। তুমি তার প্রতি তোমার রহমতের দরজা খুলে দাও।'

পরদিন প্রবল বৃষ্টিতে জীবনের মায়া ত্যাগ করে নীলগঞ্জ হ াই স্কুলের হেডমাস্টার মনসুর সাহেব আর তাঁর পাগল স্ত্রী অ াসিয়া সোহাগী নদীর পাড় থেকে ইরতাজউদ্দিনের লাশ টেনে আ নার সময় এলাকার কোনো বাঙালি নয়, বেলুচ রেজিমেন্টের সি াহি আসলাম খাঁ তাঁদের সঙ্গে হাত মেলায়।

কলমের সামান্য আঁচড়ে আঁকা আসলাম খাঁ চরিত্রটির মাধ্যমে লেখক বোঝালেন, পা কিস্তান আর্মিতেও দু-একজন হৃদয়বান মানুষ ছিলেন।

শেখ সাহেব হেসে ফেলে বললেন, তুই তো তোর গোপন কথা স ই বলে ফেললি। তুই আইবির লোক, তুই তোর পরিচয় গোপন রাখবি না?

আমি ঘ সরকারের হুকুমে আসলেও ডিউটি করি আপনার। আমি খেয় াল রাখি, যেন কেউ আপনার কোনো ক্ষতি করতে না পারে।

আমার ডিউটি করিস কী জন্যে?

কারণ আপনিই সরকার।

শেখ মুজিব এই কথায় খুবই তৃপ্তি পেলেন। মোবারক হোসেনের কাঁধে হাত রেখে বললেন, তুই আমার জন্যে কী করতে পারবি?

আপনি যা করতে বলবেন, করতে পারব। যদি বলেন, ছাদ থেকে লাফ দিয়ে নিচে পড়, আমি পড়ব।

তোর নাম কী?

মোবারক হোসেন। পুলিশ ইন্সপেক্টর।

দেশের বাড়ি কোথায়?

কিশোরগঞ্জ।

ভালো জায়গায় জন্ম। বীর সখিনার দেশ।

ছেলেমেয়ে কী?

তিন মেয়ে, এক ছেলে। তিন মেয়ের নাম—মরিয়ম, মাসুমা, মাফরুহা আর ছেলের নাম ইয়াহিয়া।

কী বলিস তুই ? ছেলের নাম ইয়াহিয়া ?

আমার দাদিজান রেখেছেন। নবীর নামে নাম।

আয় আমার সঙ্গে।

স্যার, কোথায় যাব ?

তোকে নিয়ে বাড়ির ছাদে উঠব। তারপর তোকে হুকুম দেব ছাদ থেকে লাফ দিয়ে নিচে পড়তে। দেখি হুকুম তামিল করতে পারিস কি না।

মোবারক হোসেন শান্ত গলায় বললেন, 'স্যার, চলেন।'

শেখ মুজিব মোবারক হোসেনকে নিয়ে দোতলায় এলেন। তিনি তাঁর স্ত্রীকে বললেন, এই, আমাদের দুজনকে নাশতা দাও। এ হলো আমার এক ছেলে।

অতি সামান্য এক ঘটনায়, মাত্র কয়েক লাইনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের চরিত্রের প্রধান দিকটি নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুললেন হুমায়ূন আহমেদ। মানুষের প্রতি এই মহান নেতার তীব্র ভালোবাসা, অন্যদিকে তাঁর জন্য সাধারণ মানুষের ভালোবাসা। জীবন দিয়ে দেওয়ার অঙ্গীকার।

শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের চরিত্রটি এল এভাবে :

তাঁর চোখ কালো চশমায় ঢাকা। গায়ে ধবধবে সাদা হাফহাতা গেঞ্জি। বসেছেন ঋজু ভঙ্গিতে। বাঁ হাতের কব্জিতে পরা ঘড়ির বেল্ট সামান্য বড় হয়ে যাওয়ায় হাত নাড়ানোর সময় ঘড়ি উঠানামা করছে। এতে তিনি সামান্য বিরক্ত, তবে বিরক্তি বোঝার উপায় নেই। যে চোখ মানবিক আবেগ প্রকাশ করে, সেই চোখ তিনি বেশির ভাগ সময় কালো চশমায় ঢেকে রাখতে ভালোবাসেন। মানুষটার চারপাশে এক ধরনের রহস্য আছে।

তাঁর নাম জিয়াউর রহমান।

মেজর জিয়া এস ফোর্সের অধিনায়ক কে এম শফিউল্লাহ এবং কে ফোর্সের অধিনায়ক মেজর খালেদ মোশাররফের সঙ্গে এক বৈঠকেও খোলাখুলি নিজের এই মত প্রকাশ করেন। তাঁর কথা হলো—গেরিলা ধরনের এই যুদ্ধে আমাদের সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়কের প্রয়োজন নেই। আমাদের দরকার কমান্ড কাউন্সিল। সবচেয়ে বড় কথা, সেনাবাহিনী থেকে অবসরপ্রাপ্ত কেউ সেনাবাহিনীর প্রধান হতে পারেন না।

জোছনা ও জননীর গল্পে বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকীর কথা লেখা হয়েছে এইভাবে :

> নিয়াজীর ফোঁপানো একটু থামতেই জেনারেল নাগরা তাঁর পাশে দাঁড়ানো মানুষটির সঙ্গে নিয়াজীর পরিচয় করিয়ে দিলেন। শান্ত গলায় হাসি হাসি মুখে বললেন, এই হচ্ছে সেই টাইগার সিদ্দিকী।
>
> জেনারেল নিয়াজী, জেনারেল জামশেদ অবাক হয়ে দীর্ঘ সময় তাকিয়ে থাকলেন কাদের সিদ্দিকীর দিকে। তাঁদের স্তম্ভিত ভাব কাটতে সময় লাগল। একসময় নিয়াজী করমর্দনের জন্যে তার হাত বাড়িয়ে দিলেন কাদের সিদ্দিকীর দিকে।
>
> কাদের সিদ্দিকী হাত বাড়ালেন না। তিনি সবাইকে অবাক করে দিয়ে ইংরেজিতে বললেন, নারী এবং শিশু হত্যাকারীদের সঙ্গে আমি করমর্দন করি না।

এ রকম বহু স্মরণীয় উদ্ধৃতি তুলে ধরতে ইচ্ছা করছে। কত চরিত্র, কত ঘটনার কথা মনে পড়ছে! শাহেদ, আসমানী, জোহর, মোবারক, গৌরাঙ্গ, নাইমুল, মরিয়ম, শাহ কলিম, রুনি, বি হ্যাপি স্যার, ধীরেন্দ্র রায়চৌধুরী ও কংকন। আর অতি ছোট চরিত্র হারুন মাঝি, যে ছিল একজন ডাকাত।

একটি উত্তাল সময় কীভাবে দেশের প্রায় প্রতিটি মানুষকে ঠেলে দিয়েছিল স্বাধীনতার দিকে, কীভাবে দেশপ্রেমের মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে মৃত্যুকে তুচ্ছ জ্ঞান করেছিল মানুষ, এই উপন্যাসের পাতায় পাতায় ছড়ানো আছে সেই কথা। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের, বিভিন্ন স্তরের মানুষ, কখনো একজন ঠেলাগাড়িওয়ালা, কখনো হুমায়ূন আহমেদের নিজ পরিবার, মা-বাবা, ভাইবোন, পাঙ্খাপুলার রশিদ, নানা স্তরের নানা মানুষ, কারও সঙ্গে কারও হয়তো কোনো সম্পর্ক নেই, আবার সবাই যেন সবার সঙ্গে যুক্ত। যে সুতায় সব মানুষকে একত্রে গেঁথে 'জোছনা ও জননীর গল্প' নামের এই মহৎ মালাটি হুমায়ূন আহমেদ গেঁথেছেন, সেই মালার নাম উনিশ শ একাত্তরের বাংলাদেশ। উপন্যাসটি পড়তে পড়তে একাত্তরের প্রকৃত ইতিহাস পাওয়া যাবে—ক্রোধে, আবেগে, ঘৃণায়, মমতায় এবং চোখের জলে ভাসবে মানুষ।

> তারও অনেক পরে ঘন কুয়াশার ভেতর দিয়ে বাড়ির সামনে দাড়ি-গোঁফ ভর্তি এক যুবক এসে দাঁড়াল। গম্ভীর গলায় বলল, সিঁড়িতে যে মেয়েটি বসে আছে, তাকে কি আমি চিনি ? দীর্ঘকায় এই যুবক দু'হাত ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মরিয়ম চিৎকার করে বলল, মা, দেখো কে এসেছে! মাগো, দেখো কে এসেছে!
>
> মরিয়ম যুবকটিকে জড়িয়ে ধরে আছে। যুবকের বুকে মুখ ঘষতে ঘষতে বলছে—আহা, এইভাবে সবার সামনে আমাকে

ধরে আছ কেন ? আমাকে ছাড় তো। আমার লজ্জা লাগে। নাইমুল কিন্তু তার স্ত্রীকে ধরে ছিল না। তার হাত এখনো প্রসারিত। কঠিন হাতে নাইমুলকে জড়িয়ে ধরেছিল মরিয়ম নিজেই।

পাঠক, মহান বিজয় দিবসে যে গল্প শেষ হবে, সেই গল্প আনন্দময় হওয়া উচিত বলেই আমি এ রকম একটা সমাপ্তি তৈরি করেছি। বাস্তবের সমাপ্তি এ রকম ছিল না। নাইমুল কথা রাখে নি। সে ফিরে আসতে পারে নি তার স্ত্রীর কাছে। বাংলার বিশাল প্রান্তরের কোথাও তার কবর হয়েছে। কেউ জানে না কোথায়। এই দেশের ঠিকানাবিহীন অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধার কবরের মধ্যে তারটাও আছে, তাতে কিছু যায়-আসে না। বাংলার মাটি পরম আদরে তার বীর সন্তানকে ধারণ করেছে। জোছনা রাতে সে তার বীর সন্তানদের কবরে অপূর্ব নকশা তৈরি করে। গভীর বেদনায় বলে, আহা রে! আহা রে!

হুমায়ূন আহমেদের *জোছনা ও জননীর গল্প* শুধু উপন্যাস নয়, উপন্যাসের চেয়ে বেশি কিছু। এ হচ্ছে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে রচিত এক মহাকাব্য। এত সার্থক ও সুন্দরভাবে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আর কিছু রচিত হয় নি। বাঙালির ঘরে ঘরে এই গ্রন্থ অত্যন্ত যত্নে ও মায়ায় রক্ষিত হবে। কোনো কোনো জোছনা রাতে বাংলার গ্রাম-প্রান্তরের দাওয়ায় বসে একজন তাঁর উদাত্ত গলায় পড়বেন এই উপন্যাসের একেকটি অধ্যায়, আর তাঁর চারপাশ ঘিরে বসে থাকা শ্রোতারা চোখের জলে ভাসবেন। এই উপন্যাস তাঁদের ফিরিয়ে নেবে স্বপ্ন ও দুঃস্বপ্নের সেই মিশ্র সময়ে–উনিশ শ একাত্তরে।

৭

জোছনা ও জননীর গল্প-র প্রকাশনা উৎসব হবে।

হুমায়ূন ভাই সাধারণত প্রকাশনা উৎসব ইত্যাদি এড়িয়ে চলেন। এ বইটি নিয়ে তাঁর একটু বিশেষ মায়া আছে। মাজহারের প্রস্তাবে তিনি রাজি হলেন।

২০০৪ সালের কথা।

ফেব্রুয়ারি বইমেলা চলছে। মেলার মধ্যেই আয়োজন করা হলো। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে এক বিকেলে অনুষ্ঠান। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। তিনি এলেন। কোনো বিশেষ অতিথি বা সভাপতি—এসব নেই। পাঁচজন বড়মাপের মানুষ বইটি নিয়ে কথা বলবেন। শামসুর রাহমান, সৈয়দ শামসুল হক, আনিসুজ্জামান, মুহম্মদ জাফর ইকবাল ও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করবেন আসাদুজ্জামান নূর।

এক দিন আগে হঠাৎ করে মত বদলালেন হুমায়ূন ভাই। মাজহারকে বললেন, উপন্যাস নিয়ে অনুষ্ঠান, এই অনুষ্ঠানের সঞ্চালক হবেন একজন লেখক। দায়িত্বটা তিনি আমাকে দিলেন। আলোচনা শেষে মোহিনী চৌধুরী রচিত সেই বিখ্যাত গান—

'মুক্তির মন্দির সোপানতলে কত প্রাণ হলো বলিদান
লেখা আছে অশ্রুজলে...'

খালি গলায় গেয়ে শোনালেন শাওন। হুমায়ূন ভাইকে দেখি উইংসের আড়ালে দাঁড়িয়ে শিশুর মতো কাঁদছেন। কান্নার কারণ সেই মুহূর্তে তিনি চলে গিয়েছিলেন ১৯৭১-এ। সেই ভয়ংকর সময়ের কথা ভেবে তিনি কাঁদছিলেন।

এই আবেগপ্রবণ শিশুর মতো মানুষটিই আবার খোঁচাখুঁচির ওস্তাদ, মজা করার ওস্তাদ। প্রিয় মানুষজনকে খুঁচিয়ে আনন্দ পান।

তাঁর মুখ থেকে শোনা একটি ঘটনার কথা বলি। পিএইচডি করে আমেরিকা থেকে ফিরেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আগের চাকরিতে ঢুকেছেন। হুমায়ূন আজাদের সঙ্গে বেশ বন্ধুত্ব। তিনি খুবই সিরিয়াস টাইপের মানুষ। ইংরেজি সাহিত্যের এক সেমিনারে নিয়ে গেছেন হুমায়ূন আহমেদকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কিংবদন্তিতুল্য ইংরেজির অধ্যাপক, আমি তাঁর নামটা বলছি না, তিনি বক্তৃতা করছেন। হুমায়ূন আহমেদ ভদ্রলোককে চেনেন এবং তাঁর সম্পর্কে জানেন সবই। তবু তাঁর বক্তৃতা শুনে একটু মজা করতে চাইলেন। ভদ্রলোক বক্তৃতা শেষ করে স্টেজ থেকে নেমে আসার পর হুমায়ূন আহমেদ তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। হাসিমুখে বললেন, 'স্যার, আপনার চিবিয়ে চিবিয়ে বলা ইংরেজি আমার ভালো লেগেছে।'

সেই ভদ্রলোক ইংরেজির অধ্যাপক হিসেবে এতই পস, জীবনে এ ধরনের কথা বোধ হয় শোনেনই নি। হতবাক হয়ে কিছুক্ষণ হুমায়ূন আহমেদের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'আপনি একটা কাজ করুন, আমার বক্তৃতার দু-একটি বাক্য না চিবিয়ে উচ্চারণ করুন তো।'

হুমায়ুন আজাদ গিয়েছিলেন ওয়াশরুমে। সেখান থেকে এসে পরিস্থিতি সামাল দিলেন। ইংরেজির অধ্যাপককে বললেন, 'স্যার, ও তো আমাদের হুমায়ূন আহমেদ।'

ভদ্রলোক হুমায়ূন ভাইকে চিনতে পারেন নি। নাম শুনে রাগ-বিরক্তি ভুলে গেলেন। হাসিমুখে বললেন, 'আরে, আমি তো আপনার লেখার ভক্ত।'

এক বন্ধুর বাসায় দাওয়াত খেতে গেছেন। বন্ধুপত্নী অতিযত্নে রান্নাবান্না করেছেন। বহু আইটেম। সঙ্গে আমি এবং আমাদের আরও দু-একজন বন্ধু আছেন। হুমায়ূন ভাই যা যা পছন্দ করেন, ওসবেরই আয়োজন করেছেন তিনি। বন্ধুপত্নীর রান্না তেমন সুবিধার না। তবু ভদ্রমহিলা তাঁর সাধ্যমতো চেষ্টা করেছেন। খাওয়াদাওয়া শেষ করে হুমায়ূন ভাই নির্বিকার গলায় বললেন, 'এত বাজে রান্না জীবনে খাই নি।'

আমাকে একবার বললেন, 'তোমাদের মাওয়ার ওদিককার পদ্মায় ভালো রিঠা মাছ পাওয়া যায়। তোমার বউকে বলো আমাকে রান্না করে পাঠাতে।

মাওয়া থেকে রিঠা মাছ আনালাম। আমার স্ত্রী রান্না করে পাঠালেন। হুমায়ূন ভাই খেলেন, আমার স্ত্রীকে নিজের উপন্যাস সংকলন অটোগ্রাফ দিয়ে পাঠালেন। পরদিন হঠাৎ আমাকে বললেন, 'রিঠা মাছটা মরা ছিল।'

আমি বিস্মিত। রিঠা মাছ মরা ছিল না জ্যান্ত, এটা বোঝা বেশ কঠিন। কারণ মাছটা আনার পর আমি একপলক দেখেছিলাম। একদম তাজা এবং জ্যান্ত মনে হয়েছে। রিঠা খুবই শক্ত প্রাণের মাছ, দু-চার ঘণ্টায় মরে না, ভালো রকম তাজা থাকে।

আমার খটকা লাগল। বাসায় এসে স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা, রিঠা মাছটা জ্যান্ত ছিল না?

সে বলল, 'না, আনতে আনতে মরে গিয়েছিল। তবে তাজা ছিল, ফ্রেশ ছিল।'

আমি আরেকটা ধাক্কা খেলাম। একজন মানুষ কতটা খাদ্যসচেতন হলে এটা বোঝা সম্ভব!

আমাদের যেবার তিনি কুতুবপুরে নিয়ে গেলেন, '৮৫/৮৬ সালের কথা। তাঁর বাবার নামে করা পাঠাগার উদ্বোধন। ওই যেবার হুমায়ুন আজাদ আর নির্মলেন্দু গুণ রাতভর ঝগড়া করলেন, সেবারের কথা। হুমায়ূন ভাইয়ের চাচা খুবই সমাদর করেছিলেন আমাদের, চমৎকার খাওয়াদাওয়ার আয়োজন ছিল। আমরা ফিরছিলাম ট্রেনে করে। ট্রেনের খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন হুমায়ূন ভাই, আমি তাঁর পাশে। মুগ্ধ গলায় বললাম, চাচা খুবই সমাদর করলেন আমাদের। ভালো খাইয়েছেন।

হুমায়ূন ভাই গম্ভীর গলায় বললেন, 'হুঁ, দেড় হাজার টাকার একটা বিলও ধরিয়ে দিয়েছেন।'

তখনকার দিনে দেড় হাজার টাকা অনেক টাকা।

রাতের বেলা তাঁর অতিপ্রিয় একজনের ভাইয়ের বিয়েতে যেতে হবে। হুমায়ূন ভাই দলবল ছাড়া চলতে পারেন না। আমরা সবাই রেডি। কিন্তু হুমায়ূন ভাইয়ের তেমন ইচ্ছা নেই যাওয়ার। তাঁর ইচ্ছা নিজের ফ্ল্যাটে বসে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দেবেন।

সেটা সম্ভব না। যেতেই হবে।

আমরা রওনা দিলাম অনেক রাতে। বিয়েশাদির খাওয়াদাওয়া শেষ। আমরা যাওয়ার পর নতুন করে অ্যারেঞ্জ করা হলো। খেতে শুরু করেছি। হুমায়ূন ভাই একবার মাত্র সামান্য বিরানি মুখে দিয়েই প্রচণ্ড রেগে গেলেন। হাতের ধাক্কায় প্লেট সরিয়ে প্রিয় মানুষটিকে বললেন, 'তুমি জানো না, আমি ঠান্ডা খাবার খাই না?'

খাবার তেমন ঠান্ডা ছিল না, তবু তিনি রাগলেন। এই রাগটা আসলে ওই রাগ, যাওয়ার ইচ্ছা ছিল না; প্রকাশ করলেন অন্যভাবে। আর খেলেনই না। উঠে চলে এলেন। তাঁর সঙ্গে আমাদেরও খাওয়া হলো না।

গেণ্ডারিয়ায় আমাদের বন্ধু আলমগীর রহমানের বাড়িতে বহু বছর আগে আমরা খুব আড্ডা দিতাম। আলমগীর ভাইয়ের স্ত্রী ঝরনা ভাবির রান্নার কোনো তুলনা হয় না। আলমগীর ভাই নিজেও খুব ভালো রান্না করেন। আমরা বিকেলবেলা আড্ডা দিতে বসি! রাতের বেলা তাঁর ওখানে খেয়ে যে যার বাড়ি ফিরি। ও রকম এক বিকেলবেলা হুমায়ূন ভাই এসে বললেন, 'আমি একটা সেলুনে চুল কাটাতে গিয়েছিলাম, নাকের লোম কাটার কথা বলে নাপিত আমার নাকে কাঁচি ঢুকিয়ে দিয়েছিল। আমি খুবই বিরক্ত হয়েছি। চুল না কাটিয়েই চলে আসছি। আলমগীর, একজন নাপিত ডেকে আনান, আমি আপনার এই বারান্দায় বসে চুল কাটাবো।'

৮

চুয়াডাঙ্গা থেকে এক ভদ্রমহিলা ফোন করলেন, 'হুমায়ূন আহমেদকে নিয়ে আপনার লেখাটা নিয়মিত পড়ছি। তিনি এখন কেমন আছেন এ কথা আপনি একবারও লিখছেন না। আমরা জানতে চাই তিনি কেমন আছেন।'

আমি বিনীতভাবে বললাম, আমি তাঁর অসুস্থতার কথা লিখতে চাই না। আমার কলম সায় দেয় না। তবে তাঁর অসুস্থতার কথা, তিনি এখন কেমন আছেন এসব দুচার দিন পর পর সব কাগজেই লেখা হচ্ছে।

ভদ্রমহিলা একটু নাছোড় ধরনের। বললেন, 'আপনি কবে কীভাবে তাঁর অসুস্থতার কথা জানলেন?'

আমার বলতে ভালো লাগছিল না। ব্যস্ততার ভান করে ফোন রেখে দিলাম। আজ এই লেখা লিখতে বসে মনে হচ্ছে, সেই ভদ্রমহিলার মতো হয়তো অনেক পাঠকেরই জানার আগ্রহ, আমি কীভাবে হুমায়ূন আহমেদের অসুস্থতার কথা জানলাম।

ঘটনাটা বলি।

আমার বহু বছরের পুরনো বন্ধু আলমগীর রহমান। বাংলাদেশের অত্যন্ত রুচিশীল ও বিখ্যাত প্রকাশন সংস্থা প্রতীক আর অবসরের স্বত্বাধিকারী। একসময় চমৎকার গল্প লিখতেন, সাংবাদিকতা করতেন। তারপর এলেন প্রকাশনায়। খুবই বন্ধুবৎসল মেজাজি মানুষ আলমগীর ভাই।

হঠাৎ একদিন তাঁর ফোন, 'মিলন, আপনি হুমায়ূনের সঙ্গে দেখা করেন।'

আমি অবাক। হুমায়ূন ভাই সিঙ্গাপুর থেকে ফিরেছেন?

হ্যাঁ। শাশুড়ির পায়ের চিকিৎসার জন্য গিয়েছিল। নিজের চেকআপও করিয়ে আসছে। আপনি দেখা করেন। তিন দিন পর হুমায়ূন আমেরিকায় যাচ্ছে।

আমি ছিলাম গাড়িতে। অফিসে যাচ্ছিলাম। আলমগীর ভাইকে জিজ্ঞেস করলাম, জরুরি কিছু?

বলতে পারব না। আপনি দেখা করেন।

আমি একটু চিন্তিত হলাম। ব্যাপারটা কী ?

ফোন করলাম মাজহারকে। কী খবর, মাজহার ? আলমগীর ভাই ফোন করে বললেন...

হ্যাঁ, আপনি স্যারের সঙ্গে দেখা করেন।

ব্যাপারটা কী ?

মাজহার বিষণ্ন গলায় বললেন, খারাপ খবর আছে।

কী হয়েছে ?

হুমায়ূন ভাইয়ের কোলন ক্যান্সার ধরা পড়েছে।

আমি যেন পরিষ্কার বুঝতে পারলাম না কথাটা। কী ? কী ধরা পড়েছে ?

কোলন ক্যান্সার।

প্রথমে দিশেহারা হলাম, তারপর স্তব্ধ। কথা বলতে পারছি না।

মাজহার বললেন, "সিঙ্গাপুরে যাওয়ার পর ভাবি বললেন, 'আসছ যখন, তোমার চেকআপটাও করিয়ে নাও।' চেকআপ করাতে গিয়ে ধরা পড়েছে। ওখানে চিকিৎসা করাতে রাজি হন নি। পরশুর পরদিন নিউইয়র্কে যাচ্ছেন। আমিও যাচ্ছি সঙ্গে। মেমোরিয়াল স্লোয়ান ক্যাটারিং ক্যান্সার হাসপাতালে চিকিৎসা হবে। এই হাসপাতালে সোনিয়া গান্ধীরও ক্যান্সারের চিকিৎসা হয়েছে। পৃথিবী-বিখ্যাত হাসপাতাল।"

মাজহার বলে যাচ্ছেন কিন্তু আমার কানে যেন ঢুকছে না কিছুই। মৃতের মতো অফিসে এলাম। কোনো কাজে মনই বসল না। প্রায় সারাটা দিন আমার রুমের সোফায় শুয়ে রইলাম। রাতেরবেলা একটু আগেভাগেই অফিস থেকে বেরিয়ে গেলাম দখিন হাওয়ায়। গিয়ে দেখি, হুমায়ূন ভাই যে জায়গাটায় বসে লেখালেখি করেন, বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দেন, সেখানে তাঁর পাশে বসে আছেন জুয়েল আইচ। কিছুক্ষণ পর আলমগীর ভাই এলেন, মাজহার এলেন। আমাকে দেখে সব সময়কার মতো হুমায়ূন ভাই বললেন, 'আসো, মিলন। বসো।'

আমি তাঁর পাশে বসলাম। তিনি শুরু করলেন তাঁর রসিকতা, 'শোনো মিলন, সিঙ্গাপুরের মাউন্ট এলিজাবেথে আমার আর আমার মায়ের বাইপাস হয়েছিল। একইরুমে পাশাপাশি বেডে রাখা হয়েছিল মা-ছেলেকে। এরকম ইতিহাস ওই হাসপাতালে নেই। মায়ের পাওয়া গিয়েছিল ৯টি ব্লক, ছেলের ১১টি। এবার ওই হাসপাতালে চকআপে গেছি। ডাক্তার চেকআপ করে বললেন, অমুক রুমে যাও। গেলাম। আরেক ডাক্তার চেকআপ করে বললেন, আরে, তোমার তো ক্যান্সার। বললেন এমন ভঙ্গিতে, যেন ক্যান্সার কোনো রোগই না। সর্দি-কাশির মতো সামান্য কিছু।'

আমার এমনিতেই সারা দিন ধরে মন খারাপ। হুমায়ূন ভাইয়ের রসিকতায় হাসার চেষ্টা করছি, হাসতে পারছি না। জুয়েল আইচের মুখে সব সময় হাসি

লেগেই আছে। তিনি আমার দিকে তাকালেন, কিন্তু সবসময়কার মতো প্রাণ খুলে হাসতে পারলেন না। আমি মাথা নিচু করে হুমায়ূন ভাইয়ের পাশে বসে আছি। খানিক পর শাওন এসে বসল পাশে। সে খুবই উচ্ছল, প্রাণবন্ত। একপলক তার মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারি, ভেতরের গভীর কষ্ট অতিকষ্টে চেপে সে উচ্ছল থাকার চেষ্টা করছে। আমার চোখ ভরে আসছিল কান্নায়, গোপনে চেপে রাখছিলাম চোখের পানি।

হুমায়ূন ভাই নানা রকম কথা বলে যাচ্ছিলেন, তাঁর চিরাচরিত রসিকতাও করছিলেন। 'আমি না থাকলে তো তোমার অনেক সুবিধা। তুমি তখন একচ্ছত্র রাজত্ব করবে' ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমি কাতর গলায় বললাম, প্লিজ হুমায়ূন ভাই...

শাওন উচ্ছল গলায় বলল, 'না না, মিলন আংকেলকে একক রাজত্ব করতে দেওয়া যাবে না। হুমায়ূন আহমেদ কমপক্ষে আরও ২০ বছর আছে।'

প্রিয় পাঠক, আপনাদের কারও কারও মনে হতে পারে শাওন আমাকে কেন 'মিলন ভাই' না বলে 'মিলন আংকেল' বলছে। আসলে আমাদের কয়েকজনের ক্ষেত্রে শাওন তার অভ্যাসটা বদলাতে পারে নি। যেমন—আসাদুজ্জামান নূর কিংবা আলমগীর রহমান কিংবা আমি। আমি শাওনকে চিনি ওর শিশু বয়স থেকে। বিটিভির 'নতুন কুঁড়ি'র সময় থেকে। শাওনের গুণের পরিচয় তখন থেকেই জানি। ওর অসাধারণ অভিনয়ের কথা, অসাধারণ গায়কি প্রতিভার কথা, এমনকি টিভি নাটক পরিচালনার কথা সবাই জানে। আমি তার আরেকটা বড় প্রতিভার কথাও জানি। শাওন খুবই উচ্চমানের একজন নৃত্যশিল্পী। এখন আলোকিত করছে হুমায়ূন আহমেদের জীবন, একসময় আলোকিত করেছিল 'নতুন কুঁড়ি' প্রতিযোগিতা।

কথায় কথায় কত কথা যে আসে!

শাওনকে নিয়ে একটা ঘটনার কথা বলি।

নুহাশপল্লীতে হুমায়ূন ভাইয়ের নাটকের শুটিং ছিল। আমি আর ইফতেখার নামে হুমায়ূন ভাইয়ের এক বন্ধু গেছি তাঁর সঙ্গে আড্ডা দিতে। নাটকের নায়িকা শাওন। পরদিন ইউনিভার্সিটিতে তার জরুরি ক্লাস। বিকেলবেলা ফিরতে হবে। আমি আর ইফতেখার ভাই যে মাইক্রোবাসে ফিরব, শাওনও সেই মাইক্রোবাসে আমাদের সঙ্গে রওনা দিল। রাস্তায় হঠাৎ আমি শাওনকে বললাম, শাওন একটু পুরনো দিনের হিন্দি গান শোনাও না। দু-চার লাইন যা পারো।

ধারণা ছিল, শাওন এই জেনারেশানের মেয়ে, ও কি আর পুরনো দিনের হিন্দি গান পুরোপুরি জানে কোনোটা? হয়তো দু-চার লাইন গাইতে পারবে।

শাওন আমার ধারণা তছনছ করে দিল। একটার পর একটা পুরনো দিনের হিন্দি গান গাইতে লাগল। সামসাদ বেগম, নূরজাহান, লতা মুঙ্গেশকর, গীতা দত্ত, এমনকি

মোহাম্মদ রফি, মুকেশের গানও। এমন নিখুঁত সুরে, একটি শব্দও ভুল না করে একের পর এক গেয়ে গেল। শাওন একটা করে গান শুরু করে, আমি মুগ্ধ বিস্ময়ে তার মুখের দিকে তাকাই।

নুহাশপল্লী থেকে ঢাকা, সারাটা পথ পুরনো দিনের হিন্দি গান গেয়ে শোনাল শাওন। ওর গান শুনতে শুনতে আমি চলে গেলাম আমার ছেলেবেলায়, কৈশোরকালে। সেই সময়কার আমার পুরান ঢাকার জীবনে, যেখানে চায়ের দোকানে দিনরাত বাজত এসব গান। গ্রামোফোনে, রেডিওতে। বিয়েবাড়ির অনুষ্ঠানেও বাজত।

বাংলার হেমন্ত মুখোপাধ্যায় মুম্বাইতে (তখনকার বোম্বাই) গিয়ে হয়েছিলেন হেমন্তকুমার। হিন্দি গান গেয়ে 'নাগিন' ছবির সুর করে ভারতবর্ষ মাত করে দিলেন। সেদিন শাওন শেষ গানটা গেয়েছিল হেমন্তকুমারের 'আয় আপনা দিল তো আওয়ারা'।

৯

হুমায়ূন ভাই আর আমি যে একবার বিজনেস প্ল্যান করেছিলাম, সেই ঘটনা বলি।

১৯৮৫ সালের কথা। হুমায়ূন ভাই থাকতেন আজিমপুর কবরস্থানের পশ্চিম-উত্তর দিককার গলির ভেতর তৃতীয় তলার একটি ফ্ল্যাটে। আমি গেণ্ডারিয়ায়। হুমায়ূন ভাইয়ের তো ঢাকা ইউনিভার্সিটির চাকরি আছে, তখন তিনি অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর। আমি একেবারেই বেকার। বাড়ি থেকে বিতাড়িত। থাকি কলুটোলার একটি বাসায়। চারদিকে ইটের দেয়াল, মাথার ওপর টিনের চাল। আমার স্ত্রী লজ্জায় ওই বাসায় আসেন না। তিনি থাকেন কাছেই তাঁদের তিনতলা বাড়িতে।

বিতাড়িত হওয়ার পর শাশুড়ি আমাকেও তাঁদের বাড়িতে থাকতে বলেছিলেন। ব্যর্থ লোকদের অহংকার তীব্র হয়। আমার পকেটে দশটা টাকাও নেই। তবু শ্বশুরবাড়িতে না থেকে বারো শ না পনেরো শ টাকা দিয়ে যেন ওই টিনশেড ভাড়া নিয়েছি শ্বশুরবাড়ির কাছেই।

এই বাসায় আমাকে একদিন দেখতে এসেছিলেন কবি রফিক আজাদ। আমার শোচনীয় অবস্থা দেখে নানা ধরনের জ্ঞান দিয়ে চলে গেলেন। লেখকদের জীবন এ রকমই হয়... ইত্যাদি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদাহরণও দিলেন।

আমার কি আর ওসব কথায় মন ভালো হয়!

মন ভালো করার জন্য দু-একদিন পরপরই হুমায়ূন ভাইয়ের কাছে যাই। দুপুরে তাঁর ফ্ল্যাটে খাই, বিকেলে আড্ডা দিতে যাই ইউনিভার্সিটি ক্লাবে। দু-একদিন হুমায়ুন আজাদের বাসায়। শামসুর রাহমান, সালেহ চৌধুরী, হুমায়ুন আজাদ, হুমায়ূন আহমেদ আর এই অধম, আমরা ইন্ডিয়ান অ্যাম্বাসির এক ভদ্রলোকের ধানমণ্ডির ফ্ল্যাটেও আড্ডা দিতে যাই কোনো কোনো সন্ধ্যায়। অর্থাৎ আমার খুবই এলোমেলো জীবন।

এর আগে ও পরে আমি বেশ কয়েকবার ছোটখাটো নানা রকম ব্যবসা-বাণিজ্য করার চেষ্টা করেছি। শুরু করার পর সেইসব ব্যবসায় লালবাতি জ্বলে যেতে একদম সময় লাগে নি। আমার ধারণা, আমার মতো ব্যর্থ ব্যবসায়ী এই পৃথিবীতে আর একজনও নেই। যদি কখনো আত্মজীবনী লিখি তাহলে একটা চ্যাপ্টারের শিরোনাম হবে 'আমার ব্যর্থ ব্যবসায়ী জীবন'।

যা হোক, ওই টিনশেডের বাসায় এক গরমের দুপুরে বসে ঘামে ভিজতে ভিজতে সিদ্ধান্ত নিলাম, লিখেই রুজি-রোজগারের চেষ্টা করব। এ ছাড়া আমি অন্য কোনো কাজ জানি না। '৭৭ সালের শেষদিকে সাপ্তাহিক *রোববার* পত্রিকায় ঢুকেছিলাম জুনিয়র রিপোর্টার হিসেবে। পুলিশ নিয়ে রিপোর্ট লেখার কারণে চাকরি চলে গিয়েছিল।

এসব কথা আগেও কোথাও কোথাও লিখেছি।

কিন্তু লিখে জীবনধারণের সিদ্ধান্তটা তখন ছিল প্রায় আত্মঘাতী। পত্রপত্রিকা বলতে গেলে হাতে গোনা দু-চারটা। একটা গল্প লিখলে পাওয়া যায় বড়জোর ২০ টাকা। তাও সে টাকা তুলতে বাসভাড়া, রিকশাভাড়া চলে যায় অর্ধেকের বেশি।

বিটিভি একমাত্র টিভি চ্যানেল। তিন মাসে ছয় মাসে একটা নাটক লেখার সুযোগ মেলে। তাও নানা প্রকার ধরাধরি, তদবির। শেষ পর্যন্ত নাটক প্রচারিত হলে টাকা পাওয়া যায় শ চারেক।

পাবলিশাররা বই ছাপলে সেই বই কায়ক্লেশে পাঁচ-সাত শ-এক হাজার বিক্রি হয় বছরে। রয়্যালিটি যেটুকু পাওয়া যায় তাতে মাসখানেক চলা মুশকিল।

এ অবস্থায় ও-রকম সিদ্ধান্ত।

তবে সিদ্ধান্ত মোতাবেক কাজ আমি শুরু করলাম। আজানের সময় ঘুম থেকে উঠে লিখতে বসি। টানা ১১টা ১২টা পর্যন্ত লিখি। এক ফাঁকে গরিব মানুষের দিন-দরিদ্র নাশতাটা সেরে নিই। তারপর যাই বাংলাবাজারে, প্রকাশকদের দ্বারে দ্বারে ঘুরি। কোথাও কোথাও বসে আড্ডা দিই। দুপুরে কেউ কেউ খাওয়ায়। যেদিন ও রকম হয় সেদিন আর বাড়ি ফিরি না। একবারে আড্ডা-ফাড্ডা দিয়ে রাতে ফিরি।

হুমায়ূন ভাইও তখন দু-একদিন পরপরই বাংলাবাজারে আসেন। বিউটি বুক হাউস, স্টুডেন্ট ওয়েজ আর নওরোজ কিতাবিস্তানে বসে আড্ডা দিই, চা-সিগ্রেট খাই।

ও রকম একদিনের ঘটনা।

আমরা দুজনই এক প্রকাশকের কাছ থেকে কিছু টাকা পেয়েছি। দুপুরের দিকে হুমায়ূন ভাই বললেন, চলো আমার বাসায়।

আমি সঙ্গে সঙ্গে রাজি। চলুন।

বাংলাবাজার থেকে রিকশা নিলাম। যাব আজিমপুর। তখনো বাংলাদেশের প্রকাশনা জগৎ আধুনিক হয় নি। আমাদের বইপত্র তৈরি হয় হ্যান্ড কম্পোজে, প্রচ্ছদ তৈরি হয় হাতে তৈরি ব্লকে। অফসেটে প্রচ্ছদ ছাপার কথা তখনো ভাবতে পারেন না অনেক প্রকাশক।

আমার প্রথম বই 'ভালোবাসার গল্প' ছিল ১২ ফর্মার। দাম ছিল ৭ টাকা। আমি রয়্যালটি পেয়েছিলাম ৪০০ টাকা। হুমায়ূন ভাইয়ের 'নন্দিত নরকে'র দাম ছিল সাড়ে তিন টাকা।

তখন বিশ-ত্রিশ হাজার টাকা হলে বাংলাবাজার এলাকার কোনো গলির ভেতর একটা রুম ভাড়া নিয়ে 'কম্পোজ সেকশন' করা যেত। সিসা দিয়ে তৈরি টাইপ সাজানো থাকে একধরনের কাঠের ছোট ছোট খোপওয়ালা পাত্রে। সামনে টুল নিয়ে বসে একটা একটা করে টাইপ তুলে পাণ্ডুলিপি অনুযায়ী লাইনগুলো তৈরি করে কম্পোজিটর, পৃষ্ঠা তৈরি করে। একেক খোপে একেক অক্ষরের টাইপ। ১৬ পৃষ্ঠা তৈরি হলে এক ফর্মা। ভারী একটা তক্তার ওপর ওই টাইপের দুটো করে পৃষ্ঠা। মোট আটটি ও-রকম কাঠের তক্তা চলে যায় মেশিনে। অর্থাৎ একটা ফর্মা।

এভাবে ছাপা হয় বই।

যারা বই ছাপার কাজ করে, ও-রকম প্রেসগুলোরও অনেকেরই থাকে 'কম্পোজ সেকশন'। ওসব ক্ষেত্রে ইনভেস্টমেন্টটা বেশি। আর মেশিন ছাড়া শুধু 'কম্পোজ সেকশন' ছোটখাটোভাবে করেও অল্প পুঁজিতে ব্যবসা করে কেউ কেউ।

ও রকম কম্পোজ সেকশনের একটা সমস্যা হলো কম্পোজিটররা অনেকেই সিসায় তৈরি টাইপ চুরি করে নিয়ে সের দরে বিক্রি করে ফেলে। পার্টনারশিপে যারা 'কম্পোজ সেকশন' করে তারা নিজেরাও এক পার্টনার আরেক পার্টনারের অজান্তে টাইপ চুরি করে। বিক্রি করলেই তো ক্যাশ টাকা।

রিকশায় বসে হুমায়ূন ভাইকে আমি বললাম, হুমায়ূন ভাই, চলেন আমরা দুজন একটা বিজনেস করি।

হুমায়ূন ভাই সিগ্রেট টান দিয়ে বললেন, কী বিজনেস ?

একটা কম্পোজ সেকশন করি।

হ্যাঁ, করা যায়। ভালো আইডিয়া।

কত টাকা লাগবে ?

একেকজনে দশ-পনেরো হাজার করে দিলে হয়ে যাবে।

সেটা দেওয়া যাবে।

তাহলে চলেন শুরু করি।

তোমার টাকা রেডি আছে ?

আরে না। দশ টাকাও নেই।

তাহলে ?

ধার করতে হবে।

সেটা না হয় করলে, তবে আমার একটা শর্ত আছে।

কী শর্ত ?

হুমায়ূন ভাই আমার মুখের দিকে তাকালেন। চুরি করে টাইপ বিক্রির অধিকার সমান থাকতে হবে।

আমি হাসতে হাসতে রিকশা থেকে প্রায় ছিটকে পড়ি।

আমাদের ব্যবসার ওখানেই যবনিকাপাত।

১০

পেপারব্যাকে উপন্যাস লেখার জন্য সিগারেটের প্যাকেটের ভেতর দিককার সাদা অংশে হুমায়ূন ভাই লিখলেন, '১০০০ (এক হাজার) টাকা বুঝিয়া পাইলাম।' উপন্যাস লেখার জন্য ওটাই তাঁর জীবনের প্রথম অগ্রিম নেওয়া। হাতের কাছে কাগজ ছিল না বলে সিগারেটের প্যাকেট ছিঁড়ে তার পেছন দিকে লেখা হলো। এই ঘটনা ঘটল মুনতাসীর মামুনের বাসায়, মগবাজারের ইস্পাহানি কলোনিতে।

সেই বাসা বা বাড়িটি বোধহয় এখনো মামুন ভাই রেখে দিয়েছেন। ইস্পাহানি কলোনির ভেতরে যাঁরা ঢুকেছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই দেখেছেন গাছপালায় ঘেরা, সামনে সবুজ ঘাসের লন, হলুদ একতলা পুরনো ধরনের স্টাফ কোয়ার্টার করেছিল ইস্পাহানি কর্তৃপক্ষ। স্নিগ্ধ নির্জন সুন্দর পরিবেশ। ও রকম কোয়ার্টারে সেই সময় থাকতেন মামুন ভাই। এখনো কোয়ার্টারটি তাঁর আছে, তবে তিনি ওখানে থাকেন না। প্রতিটি রুম ভর্তি বই। শুনেছি তিনি অনেক সময় লেখালেখির কাজ করতে যান ওখানে।

১৯৮৫ সাল। ২০-২২ দিন ধরে সংবাদপত্রে কর্মবিরতি চলছে। আলমগীর রহমান কাজ করেন সাপ্তাহিক *বিচিত্রা*-য়। সম্পাদক শাহাদত চৌধুরী। শাহরিয়ার কবির, মাহফুজউল্লাহ, রেজোয়ান সিদ্দিকী কাজ করেন। মুনতাসীর মামুন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রভাষক অথবা সহকারী অধ্যাপক। তার পরও *বিচিত্রার* সঙ্গে যুক্ত। নিয়মিত লেখালেখি করেন *বিচিত্রা*-য়। সংবাদপত্রে কর্মবিরতি চলে বলে অফিসে বসে চা-সিগারেট খেয়ে সময় কাটে সবার।

শাহাদত চৌধুরীর মাথাভর্তি নানা রকম আইডিয়া। আলমগীর রহমানকে বললেন, 'কাজী আনোয়ার হোসেনের সেবা প্রকাশনীর মতো করে বাংলাদেশের লেখকদের মৌলিক উপন্যাস বের করুন।'

আলমগীর ভাই রাজি হয়ে গেলেন। কারণ তাঁর রক্তের সঙ্গে প্রকাশনা। বাবা আবদুস সোবহান বিশাল প্রকাশক। পাকিস্তান বুক করপোরেশন, স্বাধীনতার পর হলো বাংলাদেশ বুক করপোরেশন, আলমগীর ভাইয়ের বাবা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এখনো সেই প্রতিষ্ঠান আগের মতোই সুনাম নিয়ে চলছে। বাবা বেঁচে থাকতেই আলমগীর ভাইয়ের বড় ভাই খলিলুর রহমান যুক্ত হয়েছিলেন সেই ব্যবসার সঙ্গে। এখনো তিনিই দেখছেন প্রতিষ্ঠানটি।

স্বাধীনতার দু-এক বছর আগে আলমগীর ভাইও মাঝেমধ্যে গিয়ে বসতেন পাটুয়াটুলীর পাকিস্তান বুক করপোরেশনে। পাঠ্য বই, রেফারেন্স বই প্রকাশ করত

প্রতিষ্ঠানটি। আলমগীর ভাই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, কিছু মৌলিক বই প্রকাশ করবেন। কারণ তখন তাঁর মাথায় সাহিত্যের পোকা ঘোরাঘুরি করছে। নিজে গল্প লেখেন। কামাল বিন মাহতাব সম্পাদিত ছোটগল্পের বিখ্যাত মাসিক পত্রিকা 'ছোটগল্প'তে নিয়মিত তাঁর গল্প ছাপা হয়। দৈনিক পত্রিকার সাহিত্য পাতায় ছাপা হয়। বিএ পরীক্ষা দিয়েছেন কিন্তু ওই বয়সেই তাঁর আড্ডার সঙ্গী শামসুর রাহমান, শহীদ কাদরী, আল মাহমুদ। গেণ্ডারিয়ায় পুরনো আমলের বিশাল জমিদারবাড়ির মতো বাড়ি আলমগীর ভাইদের। কাছাকাছি থাকেন হায়াৎ মামুদ। হায়াৎ ভাইয়ের ছোট ভাই তাঁর বন্ধু। একসময় হায়াৎ ভাইও বন্ধু হয়ে গেলেন।

আবদুল মান্নান সৈয়দ তখন সিলেটের এমসি কলেজে বাংলার প্রভাষক। প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প-সবই লেখেন। আলমগীর ভাই সিলেটে গিয়ে হাজির হলেন। মান্নান সৈয়দের প্রবন্ধের বই ছাপবেন। মান্নান ভাই বললেন, 'প্রবন্ধ না, আমার একটা গল্পের বই ছাপুন।'

আলমগীর ভাই রাজি হলেন। মান্নান সৈয়দের গল্পগ্রন্থ *সত্যের মতো বদমাস*-এর পাণ্ডুলিপি নিয়ে ঢাকায় এলেন। অতি যত্নে ছাপা হলো বই। সরকার সেই বই বাজেয়াপ্ত করল। নিষিদ্ধ হয়ে গেল *সত্যের মতো বদমাস*। আলমগীর ভাই হতাশ হয়ে এমএ পড়তে চলে গেলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে। অবশ্য এই ফাঁকে হায়াৎ মামুদের বইও ছাপা হয়েছিল তাঁদের প্রকাশনা সংস্থা থেকে।

রাজশাহীর পাট চুকিয়ে পড়াশোনা শেষ করে স্বাধীনতার পর সাংবাদিকতা শুরু করলেন আলমগীর ভাই। ১৯৮৫ সালে এসে আবার প্রকাশক হয়ে গেলেন শাহাদত চৌধুরীর বুদ্ধিতে। মুনতাসীর মামুনের বাসায় বসলেন তাঁরা। আমিও ছিলাম সেই বিকেলে তাঁদের সঙ্গে। প্রকাশনার নাম ঠিক হলো 'অবসর'। লেখক তালিকায় আমিও আছি। তবে প্রথম বইটি লিখবেন হুমায়ূন আহমেদ। এক হাজার টাকা অগ্রিম দেওয়া হলো তাঁকে। হুমায়ূন ভাই লিখলেন তাঁর আদিভৌতিক বিষয়ের উপন্যাস 'দেবী'। পেপারব্যাক সংস্করণ বেরোল।

এক বইতেই বাজিমাত। সংস্করণের পর সংস্করণ হতে লাগল। পরে হার্ড বাইন্ডিংয়েও বেরোল 'দেবী'। এ পর্যন্ত বোধহয় এক লাখ কপির ওপর বিক্রি হয়েছে। স্টেজ নাটক হয়েছে।

ওই উপন্যাসেই প্রথম মিসির আলী নামের একটি চরিত্র এল, যে চরিত্র এখন বাঙালি পাঠকের মুখে মুখে। মিসির আলীকে নিয়ে বহু উপন্যাস পরবর্তী সময়ে লিখেছেন হুমায়ূন ভাই। তাঁর দুটি জনপ্রিয় চরিত্রের একটি হিমু অন্যটি মিসির আলী।

'দেবী'র পর হুমায়ূন ভাই লিখলেন 'নিশিথিনী'। সেই উপন্যাসও জনপ্রিয়তার রেকর্ড গড়ল। আলমগীর ভাইয়ের অবসর বিশালভাবে দাঁড়িয়ে গেল। তারপর তিনি করলেন 'প্রতীক'। হুমায়ূন ভাইয়ের বহু বইয়ের প্রকাশক তিনি। খণ্ডে খণ্ডে ছাপছেন হুমায়ূন আহমেদের উপন্যাসসমগ্র। ১০-১২ খণ্ড বোধহয় বেরিয়ে গেছে। এখন

বাংলাদেশের রুচিশীল প্রকাশনার অন্যতম অবসর ও প্রতীক। বিভিন্ন বিষয়ের অসাধারণ সব বই ছাপছেন আলমগীর ভাই। আন্তর্জাতিক মানের রান্নার বই আছে অনেক।

রান্নার বই প্রকাশের ক্ষেত্রে অন্যপ্রকাশও বড় ভূমিকা রেখেছে। অসাধারণ সব রান্নার বই প্রকাশ করেছে তারা। আর প্রডাকশন এত চমৎকার, হাতে নিলে মনেই হয় না বাংলাদেশ থেকে এ ধরনের বই প্রকাশ পেতে পারে।

হুমায়ূন ভাইয়ের সঙ্গে অন্যপ্রকাশের সম্পর্ক তৈরির ঘটনাটা বলি। তার আগে বোধহয় আমার নিজের কথাও কিছু বলা দরকার, অর্থাৎ অন্যপ্রকাশের সঙ্গে আমার সম্পর্ক হলো কীভাবে।

সেটা হয়েছিল হুমায়ূন ভাইয়ের সঙ্গে অন্যপ্রকাশের সম্পর্কের আগে। বোধ হয় ১৯৯০-৯১ সাল। নানা ধরনের দুঃখদৈন্য কাটিয়ে আমি একটু একটু করে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছি। সেই টিনশেডের বাসা থেকে গেণ্ডারিয়ার রজনী চৌধুরী রোডের চারতলার ওপর ছোট্ট একটা ফ্ল্যাটে উঠেছি। ছয়-সাত শ' বর্গফুটের ফ্ল্যাট হবে। পাশের ফ্ল্যাটটি আরও ছোট। কাকলি প্রকাশনীর সেলিম ভাই থাকতেন।

কাকলিও খুব বড় প্রকাশনা সংস্থা এখন। সেলিম ভাই উত্তরায় ছয় তলা বাড়ি করেছেন। ওই অতটুকু ফ্ল্যাট ছেড়ে একসময় তিনি চলে গেলেন। সাহস করে ওই ফ্ল্যাটটাও আমি ভাড়া নিলাম। দুটি অতি ক্ষুদ্র কক্ষ। একটায় আমার বসার ব্যবস্থা, আরেকটায় লেখার টেবিল-চেয়ার, বুকশেলফ। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত ওখানে বসে লিখি। পাশের ফ্ল্যাট থেকে চা-নাশতা পাঠান স্ত্রী। আমার কাছে কেউ এলে তাঁরাও ওখানটায়ই বসেন।

আমার ওই ছোট্ট ফ্ল্যাটে বহুবার গেছেন হুমায়ূন ভাই। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় এলেন একবার, সমরেশ মজুমদার এলেন দু-তিনবার, রফিক আজাদ, সৈয়দ শামসুল হকসহ অনেকেই।

এক দুপুরে কলিংবেল বাজল। দরজা খুলে দেখি আবু ইসহাক দাঁড়িয়ে আছেন। দেখে আমার মনে হয়েছিল দৃশ্যটা বাস্তব, না আমি স্বপ্ন দেখছি!

এত বড় একজন লেখক আমার ফ্ল্যাটে!

আবু ইসহাক সাহেবের হাতে একটা বই। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস *পদ্মার পলিদ্বীপ*। বইটি তিনি আমাকে উপহার দেওয়ার জন্য বাংলাবাজার থেকে ঠিকানা জোগাড় করে আমার ফ্ল্যাটে এসেছেন।

সেটি আমার জীবনের একটি স্মরণীয় দিন।

পদ্মার পলিদ্বীপ-এর প্রথম নাম ছিল 'মুখর মাটি'। ১৯৭৬ সালে বাংলা একাডেমীর *উত্তরাধিকার* পত্রিকায় 'মুখর মাটি' নামে ছাপা হচ্ছিল। পাশাপাশি ছাপা হচ্ছিল আমার প্রথম উপন্যাস 'যাবজ্জীবন'। পত্রিকাটি সম্পাদনা করতেন রফিক আজাদ। বই করার সময় প্রচুর ঘষামাজা করেছেন ইসহাক সাহেব, নাম বদলেছেন।

বাংলাদেশের নদী আর চরের জীবন নিয়ে *পদ্মার পলিদ্বীপ*-এর মতো উপন্যাস আর একটিও লেখা হয় নি। এ এক কালজয়ী উপন্যাস।

আমার ওই ফ্ল্যাটে একদিন এলেন চার যুবক। তাঁদের সঙ্গে পরিচয় বাংলা একাডেমীর বইমেলায়। পজিট্রন নামে একটি প্রকাশনা করেছেন। এখন *অন্যদিন* নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা করবেন এবং প্রকাশনা করবেন। বাংলা একাডেমীতে পরিচয়ের সময়ই আমার বই ছাপার আগ্রহ প্রকাশ করলেন। তখনো তাঁদের প্রত্যেকের নাম জানা হয় নি। যেদিন আমার ফ্ল্যাটে এলেন, নাম জানলাম চারজনেরই—মাজহারুল ইসলাম, মাসুম রহমান, সিরাজুল কবির চৌধুরী (এই যুবকের ডাকনাম কমল) আর আবদুল্লাহ্ নাসের। তাঁরা আমার বইয়ের জন্য এসেছেন।

চা খেতে খেতে মাজহার আচমকা একটা পলিথিনের শপিং ব্যাগ আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন; 'এখানে দুই লাখ টাকা আছে। একুশে ফেব্রুয়ারি বইমেলায় আপনার একটা বই চাই।'

আমি কী করব খানিকক্ষণ বুঝতেই পারলাম না। সেদিনকার আগে দুই লাখ টাকা আমি একসঙ্গে কখনো চোখেই দেখি নি। একটা বইয়ের জন্য এত টাকা অগ্রিম! এই টাকা দিয়ে কী করব বুঝতেই পারছিলাম না।

মাজহারদের সেই টাকায় আমার জীবন ঘুরতে শুরু করেছিল।

হুমায়ূন ভাইয়ের ক্ষেত্রে আরও বড় ঘটনা ঘটালেন এই চার যুবক। হুমায়ূন ভাইয়ের কাছে গিয়ে হাজির একদিন—স্যার, আমরা আপনার একটা বই করব ?

হুমায়ূন ভাইয়ের তত দিনে অনেক প্রকাশক। ঈদসংখ্যার লেখা, বইমেলার লেখা, নাটক লিখছেন বিটিভিতে (তখনো স্যাটেলাইট চ্যানেলগুলো আসে নি)। পাশাপাশি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতা। অত্যন্ত ব্যস্ত মানুষ। এড়িয়ে যাওয়ার জন্য বললেন, 'একটা বইয়ের জন্য আমাকে ১০ লাখ টাকা অগ্রিম দিতে হবে।'

তাঁরা একটু চমকালেন, চিন্তিত হলেন। সম্ভবত '৯৭-৯৮ সালের কথা। কোনো কথা না দিয়ে বেরিয়ে এলেন। হুমায়ূন ভাই ভাবলেন, যাক ঝামেলা গেছে।

হুমায়ূন ভাই তখন সিনেমা তৈরির পরিকল্পনা করছেন। বিজয়নগরের ওদিকে একটা অফিস নিয়েছেন। মাজহাররা চারজন পরদিন সেই অফিসে গিয়ে হাজির। একজনের হাতে বাজার করার চটের বড় একটা ব্যাগ। হুমায়ূন ভাইয়ের সামনে গিয়ে ব্যাগটা উপুড় করে দিলেন–'স্যার, এই যে ১০ লাখ টাকা। বই দেবেন কবে ?'

তার পরের ইতিহাস আর বলার দরকার নেই। এখন অন্যপ্রকাশ বিশাল ব্যাপার। হুমায়ূন ভাইয়ের প্রধান প্রকাশক। বাংলা একাডেমী বইমেলায় অন্যপ্রকাশের স্টলের সামনে পৌঁছতে ২০ মিনিট থেকে আধা ঘণ্টা সময় লাগে, এমন লাইন। শুধু হুমায়ূন ভাইয়ের বইয়ের জন্য।

আমি একবার বলেছিলাম, হুমায়ূন ভাইয়ের কারণে বাংলা একাডেমীর বইমেলা একদিকে কাত হয়ে গেছে। শুনে তসলিমা নাসরিন খুব হেসেছিলেন।

'পদ্মা গোমতী' বেশ নামকরা সংগঠন।

বাংলাদেশ এবং আগরতলা মিলিয়ে কার্যক্রম চলে সংগঠনের। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে 'পদ্মা গোমতী'র সভাপতি ড. আনিসুজ্জামান আর আগরতলার হচ্ছেন অনিল ভট্টাচার্য। এই সংগঠনের সঙ্গে জড়িত *ত্রিপুরা দর্পণ* পত্রিকার সম্পাদক সমীরণ দত্ত, কবি রাতুল দেববর্মণ প্রমুখ।

রাতুল দেববর্মণ বিখ্যাত দেববর্মণ পরিবারের লোক। শচীন দেববর্মণ ও রাহুল দেববর্মণ আলোকিত করেছেন যে পরিবার। শচীনকর্তার স্ত্রী মীরা দেববর্মণও কম বিখ্যাত নন। কী অসাধারণ সব গান লিখেছেন! আর শচীনকর্তার গানের কথা না-ই বা বললাম। বাংলা গানে সম্পূর্ণ আলাদা একটি ঘরানা সৃষ্টি করেছেন তিনি। সুরের মায়ায় এবং কণ্ঠের জাদুতে শচীন কর্তা বাঙালি সংগীতপ্রেমীদের হৃদয়ে চিরকালীন জায়গা করে নিয়েছেন। বাঙাল মুলুক ছাড়িয়ে বোম্বেতে (আজকের মুম্বাই) পাড়ি জমালেন। হিন্দি গানের জগতেও হয়ে উঠলেন কিংবদন্তি। এমন সব বিখ্যাত ও হিট ছবির সুর করলেন, উপমহাদেশ মাতিয়ে দিলেন। লতা মুঙ্গেশকর, মোহাম্মদ রফি, কিশোরকুমার—আরও কত কত গায়ক তাঁর সুর করা গান গেয়ে জগৎ জয় করলেন!

শচীন দেববর্মণের সুর করা বহু হিন্দি ছবি থেকে দুটোর কথা বলি। একটি ছবির নাম 'অমর প্রেম'। অভিনয় করলেন রাজেশ খান্না ও শর্মিলা ঠাকুর। কিশোরকুমার তাঁর অসাধারণ কণ্ঠে গাইলেন হৃদয় তোলপাড় করা গান। মূল গল্প বাংলা সাহিত্যের তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের একজন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের। কী অসাধারণ প্রেমের গল্প, কী অসাধারণ প্রেমের ছবি!

আরেকটি ছবির নাম 'গাইড'। ভারতীয় ইংরেজি ভাষার লেখক আর কে নারায়ণের গল্প, অভিনয় করলেন দেব আনন্দ ও ওয়াহিদা রেহমান। গানগুলোর কোনো তুলনা হয় না। দুটো ছবিতেই শচীনকর্তা নিজের কণ্ঠ সামান্য একটু ব্যবহার করলেন। 'অমর প্রেম'-এর গানটির একটি লাইন আমার মনে পড়ছে, 'ও মাইয়ারে...'। 'গাইড'-এ দু-তিন লাইনে তিনি গেয়েছিলেন গ্রামবাংলার বিখ্যাত সেই গান—

আল্লাহ মেঘ দে পানি দে
ছায়া দে রে তুই
শচীন দেববর্মণ হিন্দিতে করলেন—
মেঘ দে পানি দে
ছায়া দে রে তু রামা মেঘ দে

এখনো কানে লেগে আছে সেই সুর।

তাঁর একটি বিখ্যাত গান (আসলে বিখ্যাত বিখ্যাত বারবার বলা ঠিক হচ্ছে না। শচীনকর্তার সব গানই বিখ্যাত)

বাজে তাকদুম তাকদুম বাজে
বাজে ভাঙা ঢোল

আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় এই গানের লাইন বদলে তিনি গাইলেন

বাজে তাকদুম তাকদুম বাজে বাংলাদেশের ঢোল
সব ভুলে যাই তাও ভুলি না বাংলামায়ের কোল।

আমার বহুদিনের শখ ছিল একবার আগরতলায় যাব, শচীনকর্তার বাড়িটা দেখে আসব। আমাদের মুক্তিযুদ্ধ অনেকখানি সংগঠিত হয়েছিল আগরতলায়। শরণার্থী ক্যাম্প হয়েছিল, মুক্তিযোদ্ধারা ট্রেনিং নিয়েছিল। লক্ষ লক্ষ বাঙালি ১৯৭১-এ আশ্রয় নিয়েছিলেন আগরতলায়। আগরতলাটা একবার দেখতেই হবে।

২০০৫ সালে সেই সুযোগ হলো।

'পদ্মা গোমতী' সংগঠন আমন্ত্রণ জানাল হুমায়ূন আহমেদকে। তাঁর সঙ্গে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক শফি আহমেদ, প্রকাশক আলমগীর রহমান, মাজহারুল ইসলাম এবং আমাকে।

হুমায়ূন ভাই দলবল ছাড়া চলতে পারেন না। তাঁর প্রিয় বন্ধু আর্কিটেক্ট আবু করিমকে নিলেন সপরিবারে; অন্যপ্রকাশের মাজহার, কমল আর নাসের সস্ত্রীক। মাজহারের বড় ছেলে অমিয় তখন খুব ছোট। শাওন তখনো মা হন নি।

বেশ বড় রকমের একটা বহর আমরা রওনা দিলাম। কমলাপুর থেকে বাসে করে আখাউড়া। বর্ডারের বাংলাদেশ অংশের কর্মকর্তারা খুবই খাতির করে চা-নাশতা খাওয়ালেন আমাদের। তারপর বর্ডার ক্রস করলাম। ওপারে দেখি রাতুল দেববর্মণের সঙ্গে অনিল ভট্টাচার্য, সমীরণ দত্ত আর আমাদের শফি ভাই। তিনি দুদিন আগেই আগরতলায় পৌঁছে গেছেন। আমাদের এগিয়ে নিতে আসছেন বর্ডারে।

শফি আহমেদের আমি বিশেষ ভক্ত। বিচ্ছিন্নভাবে তাঁর লেখা পড়েছি। বেশির ভাগই প্রবন্ধ। মুগ্ধ হলাম যে বই পড়ে, সেই বইয়ের নাম *মুক্তো*। জন স্টাইনবেকের 'পার্ল'-এর অনুবাদ। এত স্বচ্ছ সুন্দর প্রাঞ্জল অনুবাদ আমি কমই পড়েছি। আর শফি ভাই এত ভালো মানুষ, এত হাসিমুখের মানুষ, কী বলব।

হুমায়ূন ভাইও তাঁকে খুব পছন্দ করেন। নিজের পছন্দের মানুষদের নানাভাবে খুঁচিয়ে আনন্দ পান তিনি, অদ্ভুত অদ্ভুত নামে ডেকে আনন্দ পান। শফি ভাই ভগবান কৃষ্ণের রংটি পেয়েছেন। হুমায়ূন ভাই তাঁকে ডাকেন 'কালো বুদ্ধিজীবী'।

আমি সাহিত্য নিয়ে কঠিন কঠিন চিন্তাভাবনা করি, হুমায়ূন ভাইয়ের সঙ্গে পরিচয়ের প্রথম দিককার কথা। তখন মুগ্ধ হয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পড়ছি। সাহিত্যের আলোচনা উঠলেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নিয়ে কথা বলি। হুমায়ূন ভাই বইমেলায় আমাকে তাঁর *ফেরা* উপন্যাসটি উপহার দিলেন। অটোগ্রাফের জায়গায় লিখলেন 'আমাদের মানিকবাবুকে'।

রবীন্দ্রনাথকে মাথায় তুলে রেখেছিলেন আগরতলার মহারাজরা। এই সেই আগরতলা, এখানে বসবাস করতেন শচীন দেববর্মণ। এই সেই আগরতলা, আমাদের জীবনের সবচেয়ে বড় গৌরব মহান মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতাসংগ্রামে যে আগরতলার অবদান ইতিহাসের পাতা উজ্জ্বল করে থাকবে।

আগরতলায় তখন একটা বইমেলা চলছে।

বিকেলবেলা সদলবলে বইমেলায় গেলাম আমরা। বিশাল এলাকাজুড়ে বইমেলা। আমাদের বাংলা একাডেমী বইমেলার মতো ভিড় ধাক্কাধাক্কি নেই। লোকজন কম। ঘুরে ঘুরে বইপত্র দেখছে, কিনছে।

একদিন বইমেলার স্টেজে উঠলাম আমরা। বাংলাদেশি লেখক প্রকাশক। হুমায়ূন ভাই তাঁর স্বভাবসুলভ মজার ভঙ্গিতে বক্তৃতা দিলেন।

আমাদের দিনগুলো কাটছিল এদিক-ওদিক ঘুরে। বড় একটা মাইক্রোবাস দেওয়া হয়েছে ঘুরে বেড়ানোর জন্য। গাইড আছে সঙ্গে। আমরা এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়িয়ে দিন কাটাচ্ছি। দর্শনীয় জায়গাগুলো দেখছি।

প্রথম দিন বেড়িয়ে ফেরার পর মাইক্রোবাসের ড্রাইভারকে এক শ' রুপি অফার করলেন হুমায়ূন ভাই। লোকটি অবাক। কিসের টাকা, দাদা ?

আপনি চা-টা খাবেন।

না না, টাকা আমি নেব না।

কেন ?

এই ডিউটি করার জন্য সরকার আমাকে মাইনে দিচ্ছে। আমি আপনার টাকা নেব কেন ?

আমরা হতভম্ব!

আগরতলার 'নীরমহল' খুব বিখ্যাত পর্যটনকেন্দ্র। চারদিকে পানি, মাঝখানে জমিদারবাড়ি। সেটাই এখন পর্যটনকেন্দ্র। স্পিডবোটে করে যেতে হয়। একটা রাত ওখানে কাটালাম আমরা।

আগরতলায় আমার সঙ্গে অদ্ভুত এক মজা করলেন হুমায়ূন ভাই। এমন লজ্জার মধ্যে ফেললেন আমাকে, আমি একেবারে চুপসে গেলাম।

ঘটনা হলো কী, 'পদ্মা গোমতী' থেকে আমাদের সংবর্ধনা দেওয়া হচ্ছে একটি হলে। সন্ধ্যার পর বেশ ভালো আয়োজন করা হয়েছে। রাতুল দেববর্মণ, অনিল ভট্টাচার্য, সমীরণ দত্ত বক্তব্য দিলেন। একে একে আমাদের উত্তরীয় পরানো হলো। আগরতলার কিছু সুধীজন আর আমাদের পুরো দল।

মাজহারের ছেলে অমিয় তখন আড়াই-তিন বছরের। ওই বয়সী শিশু যেমন হয় তেমনই। চঞ্চল, ছটফটে। এই এদিকে ছুটছে, এই ওদিকে ছুটছে। মাজহারের স্ত্রী স্বর্ণা চমৎকার মেয়ে। সে আপ্রাণ চেষ্টা করছে ছেলেকে সামলাতে। দুরন্ত শিশুটির

সঙ্গে কুলিয়ে উঠতে পারছে না। শিশুটি তো আর সাহিত্য কিংবা হুমায়ূন আহমেদ বোঝে না, আগরতলা কিংবা 'পদ্মা গোমতী' বোঝে না, সে তার মতো কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। কেউ কিছু ভাবছেও না, মনেও করছে না।

হুমায়ূন ভাই খেয়াল করছিলেন অমিয়র দুরন্তপনা। আমি তাঁর পাশে বসে আছি। আমার কানের কাছে মুখ এনে বললেন, একটা কাজ করব নাকি ?

কী ?

অমিয়কে একটা থাপ্পড় লাগিয়ে দেব নাকি ? (একেবারেই মজা করা অর্থে। কোনো শিশুর গায়ে হুমায়ূন আহমেদ হাত তুলবেন, ভাবাই যায় না)

আমি থতমত খেয়ে হুমায়ূন ভাইয়ের মুখের দিকে তাকালাম। কী বলছেন, হুমায়ূন ভাই!

তার মানে তুমি থাপ্পড় মারতে না করছ ?

আরে!

ওই পর্যন্তই। অনুষ্ঠান শেষ হলো। খাওয়াদাওয়া শেষ হলো। আমরা আড্ডা দিতে বসছি, হুমায়ূন ভাই গম্ভীর গলায় মাজহারকে ডাকলেন। শোনো মাজহার, একটা কথা তোমাকে না বলে পারছি না।

মাজহার তটস্থ। কী কথা স্যার ?

গোপন কথা। বলা উচিত না। তবু বলছি। এইটুকু একটা শিশু, তার ব্যাপারে... মানে আমি অমিয়র কথা বলছি।

কী হয়েছে স্যার ?

মিলন তোমার ছেলেকে থাপ্পড় মারতে চেয়েছে।

আমি আকাশ থেকে পড়লাম। হায় হায়, বলে কী ? নিজে ওরকম একটা প্ল্যান করে এখন আমার ওপর চাপিয়ে দিচ্ছেন সব!

আমার মুখে আর কথা জোটে না। কী বলবো ?

দলের সবাই এ ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছে। স্বর্ণা একপলক আমার দিকে তাকিয়ে মুখ নিচু করেছে। মাজহার স্বাভাবিক কারণেই গম্ভীর।

আমি কীভাবে তাদেরকে বোঝাবো ঘটনা পুরো উল্টো। একটা সময়ে অবশ্য সবাই বুঝে গেল এটা হুমায়ূন ভাইয়ের রসিকতা। তবে তারপর যে কদিন আমরা আগরতলায় ছিলাম সে কদিন তো বটেই, ঢাকায় ফিরেও হুমায়ূন ভাই মাঝে মাঝে বলতেন, তোমার ছেলেকে থাপ্পড় মারতে চাইলো মিলন, আর তুমি তাকে কিছুই বললে না মাজহার!

অমিয় এখন বড় হয়েছে। মাজহার-স্বর্ণার সংসার উজ্জ্বল করে আরেকজন অমিয় এসেছে। এখনও অমিয়র দিকে তাকালে আগরতলার সেই ঘটনা আমার মনে পড়ে। যতদিন বেঁচে থাকবো, অমিয়কে দেখলেই ঘটনাটা আমার মনে পড়বে।

সেদিনকার সেই অনুষ্ঠানে খালি গলায় চমৎকার দু'তিনটা গান গেয়েছিল শাওন। আমরা তো আগে থেকেই শাওনের গানে মুগ্ধ, আগরতলার সুধীজনরাও মুগ্ধ হয়েছিলেন।

আগরতলায় শচীন দেববর্মণের বাড়ি আমরা দেখেছিলাম, বইমেলা যেখানে হচ্ছিল সেই সড়কটির নাম 'শচীন দেববর্মণ সড়ক'। এক নির্জন দুপুরে সেই সড়কের দিকে তাকিয়ে আমার মনে পড়ছিল, 'তুমি যে গিয়াছো বকুল বিছানো পথে।'

এই লেখাটুকু হুমায়ূন আহমেদের

কিছুদিন হলো আমার জীবনচর্যায় নতুন সমস্যা যুক্ত হয়েছে। সন্ধ্যা মিলাবার আগেই সিরিয়াস মুখভঙ্গি করে তিন-চারজন আমার বাসায় উপস্থিত হচ্ছে। আমার মায়ের শোবার ঘরটিতে ঢুকে যাচ্ছে। নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে এসি ছেড়ে দিচ্ছে। গলা উঁচিয়ে চা-নাশতার কথা বলছে। এই ফাঁকে একজন ক্যাসেট রেকর্ডার রেডি করছে। অন্য একজন ক্যামেরায় ফিল্ম ভরছে। তৃতীয়জন কাগজ-কলম নিয়ে প্রস্তুত। চতুর্থজন ব্যস্ত হয়ে মোবাইলে টেলিফোন করছে ইমদাদুল হক মিলনকে। ঔপন্যাসিক চলে এলেই কর্মকাণ্ড শুরু হবে। ঔপন্যাসিক আমার ইন্টারভিউ নেবেন।

ইমদাদুল হক মিলনের সমস্যা কী আমি জানি না। ইদানীং সে সবার ইন্টারভিউ নিয়ে বেড়াচ্ছে। টিভি খুললেই দেখা যায় সে কারও-না-কারও ইন্টারভিউ নিচ্ছে। পত্রিকার পাতাতেও দেখছি অনেকেই তার প্রশ্নবাণে জর্জরিত। কিছুদিন আগে পশ্চিমবঙ্গ থেকে ঔপন্যাসিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সস্ত্রীক বেড়াতে এসেছিলেন। তাঁরাও রক্ষা পান নি। তিন দিন ধরে ক্রমাগত তাঁদের ইন্টারভিউ হলো। আমার দখিন হাওয়ার বাসাতেই হলো।

মিলন জানেও না ইন্টারভিউ নিতে নিতে তার গলার স্বরেও কিছু পরিবর্তন হয়েছে। চোখের দৃষ্টিও অন্যরকম। এখন তার চোখে শুধু প্রশ্ন খেলা করে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আমি কেন এই ফাঁদে পা দিলাম ? সন্ধ্যাটা আগে বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে ভালোই কাটত। এখন ক্যাসেট প্লেয়ার মুখের সামনে ধরে মিলন বসে থাকে। সামান্য ঝুঁকে এসে প্রশ্ন করে—

ইমদাদুল হক মিলন : আপনার সাম্প্রতিক উপন্যাস 'লীলাবতী' দিয়েই শুরু করছি। এটা পড়ে মনে হয়েছে, প্রধান চরিত্র হচ্ছে সিদ্দিকুর রহমান। এই উপন্যাসটির নাম 'সিদ্দিকুর রহমান' বা 'সিদ্দিকুর রহমানের জীবন' এ রকম হতে পারত। 'অনিল বাগচীর একদিন' নামে আপনার একটা বই আছে। উপন্যাসের প্রধান চরিত্রের নামেই যদি নামকরণ করেন, তাহলে উপন্যাসটির নাম 'লীলাবতী' কেন ?

হুমায়ূন আহমেদ : আমি তো মনে করি যে, 'লীলাবতী' উপন্যাসে যে কটি চরিত্র এসেছে, প্রতিটিই প্রধান চরিত্র।

[ভুল উত্তর। উপন্যাসের সব চরিত্রই প্রধান হতে পারে না। ঔপন্যাসিক মিলন অবশ্যই এটা জানে। কিন্তু সে এমন ভাব করল যেন সে আমার উত্তর গ্রহণ করেছে। সে দ্বিতীয় প্রশ্ন করল—]

ইমদাদুল হক মিলন : তাহলে 'লীলাবতী' নামটি কেন রাখলেন ?

[প্রবল ইচ্ছা হলো বলি—আমার ইচ্ছা। তোমার কী ?

এই জাতীয় উত্তর দেওয়া যায় না। অনেক পাঠক পড়বে। জ্ঞানগর্ভ কিছু বলা দরকার। জ্ঞানগর্ভ কিছু মাথায় আসছে না। কী করি ? উপন্যাসের নাম নিয়ে মিলনের মাথাব্যথার কারণটাও ধরতে পারছি না। আমি বললাম—]

হুমায়ূন আহমেদ : উপন্যাসের নাম হিসেবে 'লীলাবতী' নামে যে মাধুর্য আছে 'সিদ্দিকুর রহমান' নামে কি সে মাধুর্য আছে ?

ইমদাদুল হক মিলন : অবশ্যই এটা একটা সুন্দর নাম।

[মিলন মুখে বলল, এটা একটা সুন্দর নাম; কিন্তু তার চেহারা দেখে মনে হলো সে আমার কথাবার্তায় পুরোপুরি সন্তুষ্ট না। তার চেহারায় প্রশ্নবোধক চিহ্ন পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। তখন আমার মনে হলো—আচ্ছা মিলন কি ভাবছে আমি 'লীলাবতী' নামটি বাণিজ্যিক কারণে রেখেছি ? তাই যদি হয় তাহলে তো নামকরণের ব্যাপারটি ভালোমতো ব্যাখ্যা করা দরকার। বইয়ের ফ্ল্যাপে এই ব্যাখ্যা আছে। আমি পরিষ্কার বলেছি—ভারতীয় গণিতজ্ঞ ভাস্করাচার্যের কন্যার নাম 'লীলাবতী'। এই নামটির প্রতি আমার অস্বাভাবিক দুর্বলতা আছে। তবে আমি এত ব্যাখ্যায় গেলাম না, সরাসরি মূল বিষয়ে চলে গেলাম—]

হুমায়ূন আহমেদ : মিলন, তুমি যদি মনে করো আমি 'লীলাবতী' নামটি দিয়েছি বাণিজ্যিক চিন্তাভাবনায়, তাহলে ভুল করবে। আমার ভালো লেগেছে, তাই এই নাম দিয়েছি। বইয়ের নামের কারণে কিছু বই বেশি বিক্রি হবে—এটা নিয়ে আমার প্রকাশক মাথা ঘামাতে পারে। আমি ঘামাই না।

[আমার কঠিন কথায় মিলন একটু থমকে গেল এবং অতি দ্রুত নিজেকে সামলে নিয়ে বলল—]

ইমদাদুল হক মিলন : আপনার উপন্যাসের ক্ষেত্রে নাম কোনো ফ্যাক্টর না। আপনি 'মন্দ্রসপ্তক' নামে একটি বই লিখেছিলেন। এই শব্দটির অর্থও অনেকে জানেন না। আপনি বাংলাদেশ টেলিভিশনে একটি নাটক লিখেছিলেন–'অয়োময়'। এই শব্দের সঙ্গে বেশির ভাগ বাঙালি পরিচিত নন। আপনার লেখার ক্ষেত্রে নাম কোনো ফ্যাক্টর না। ওইভাবে আমি ভাবি নি।

হুমায়ূন আহমেদ : তার পরও কিন্তু ফ্যাক্টর থাকে, মিলন। আমি দেখেছি। অন্যপ্রকাশ আমার দুটি বই 'বাসর' ও 'সৌরভ' প্রকাশ করেছে। তুমি দেখবে, 'বাসর'-এর বিক্রি হয়েছে অনেক বেশি। 'বাসর' নামটি হয়তো মানুষকে আকর্ষণ করেছে অনেক বেশি, দেখি তো কী আছে বইটিতে। 'সৌরভ' কিন্তু ততটা আকর্ষণ করে নি। 'সৌরভ' উপন্যাসটির নাম যদি 'বাসর' দিতাম এবং 'বাসর' উপন্যাসটির নাম 'সৌরভ' দিতাম তাহলেও একই ঘটনা ঘটত।

ইমদাদুল হক মিলন : (বিজয়ীর ভঙ্গিতে) তাহলে তো আপনি স্বীকারই করলেন যে, নামের একটি বাণিজ্যিক ব্যাপার আছে।

হুমায়ূন আহমেদ : হ্যাঁ স্বীকার করলাম। তবে বইয়ের নাম দেওয়ার সময় বাণিজ্যিক ব্যাপারটা আমার মাথায় কখনো থাকে না। যদি থাকত তাহলে 'সৌরভ' উপন্যাসটির নাম দিতাম 'গোপন বাসর'। হা হা হা।

[বুদ্ধিমান পাঠক সম্প্রদায়, আপনারা কি লক্ষ করছেন—মিলন আমাকে দিয়ে স্বীকার করিয়ে নিল যে নামের একটা বাণিজ্যিক ব্যাপার আছে। এখন আমার কি উচিত না আরও সাবধানে তার প্রশ্নের জবাব দেওয়া ? কে জানে সে হয়তো এমন অনেক কিছু আমার মুখ দিয়ে বলিয়ে নেবে, যা আমার মনের কথা না। কাজেই Attention, সাবধান। প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার ব্যাপারে সাবধান। মিলন গভীর জলের পাঙ্গাশ মাছ। আমার মতো অল্প পানির 'তেলাপিয়া' না।]

ইমদাদুল হক মিলন : আপনি প্রচুর ভূতের গল্প লিখেছেন। অবিস্মরণীয় কিছু ভূতের গল্প-উপন্যাস লিখেছেন। বৃহন্নলা, দেবী, নিশিথিনী, অন্যভুবন—এই যে লেখাগুলো, এগুলোর মধ্যে আপনি আদিভৌতিক এবং রহস্যময়তার ব্যাপারগুলো সব সময়ই এনেছেন। পাশাপাশি আপনি আবার বলেছেন যে, বিজ্ঞানের ছাত্রদের এই বিষয়ে বিশ্বাস থাকা ঠিক না। আপনি যখন এই লেখাগুলো লেখেন, তখন কি বিজ্ঞানের ব্যাপারটি মাথায় রেখে লিখেছিলেন ?

[মিলন কোন দিকে যাবে বুঝতে পারছি। সে আবারও আমাকে দিয়ে স্বীকার করাবে যে আমি নিজেকে 'কনট্রাডিক্ট' করছি। একই সঙ্গে বিজ্ঞানের কথা বলছি আবার ভূত-প্রেতের কথা বলছি। অতি সাবধানে এখন উত্তর দিতে হবে। সবচেয়ে ভালো হয় প্রশ্নগুলো পাশ কাটিয়ে যাওয়া।]

হুমায়ূন আহমেদ : বিজ্ঞান তো থাকবেই। কিন্তু সব ব্যাখ্যা কি বিজ্ঞান দিতে পারছে ? মহাবিশ্বের শুরু হলো বিগ ব্যাং (Big Bank) থেকে। তার আগে কী ছিল ?

[মিলন ভুলবার মানুষ না। সে এই বিষয়ে দ্বিতীয় প্রশ্ন করল। আমাকে ঠেলা ধাক্কা দিয়ে খাদে ফেলতে চাচ্ছে...]

ইমদাদুল হক মিলন : বিভিন্ন সময়ে অনেক আড্ডায় আপনি প্রচুর ভৌতিক গল্প বলেন। আপনাকে আমরা যত দূর জানি, আপনি একজন যুক্তিবাদী মানুষ, অযৌক্তিক কোনো কিছুকে আপনার প্রশ্রয় দেওয়ার কথা না। তাহলে...?

হুমায়ূন আহমেদ : আমার চরিত্রের একটি অংশ হিমু, আরেক অংশ মিসির আলী। হিমু তো যুক্তিহীন জগতের মানুষ।

ইমদাদুল হক মিলন : আপনার কথা শুনে মনে হয়, আপনার মধ্যে একসঙ্গে অনেকগুলো মানুষ বসবাস করে।

হুমায়ূন আহমেদ : শুধু আমার মধ্যে কেন, সবার মধ্যেই বাস করে। মিলন! তোমার মধ্যে কি বাস করে না ? 'A man has many faces'. শুধু জন্তুর একটাই 'Face' থাকে। মানুষ জন্তু না।

[মোটামুটি 'জ্ঞানগর্ভ' উত্তর দেওয়া হলো। আমি খুশি। মিলনকে তেমন খুশি মনে হচ্ছে না।]

ইমদাদুল হক মিলন : তাহলে আপনাকে একটি প্রশ্ন করি, মানুষ হিসেবে আপনি নিজেকে কীভাবে মূল্যায়ন করবেন এবং নিজেকে কোন স্তরের মনে করেন ?

হুমায়ূন আহমেদ : মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, আমি খুবই উঁচু স্তরের। মাঝে মাঝে মনে হয়, আমি খুবই নিচুস্তরের একজন মানুষ।

ইমদাদুল হক মিলন : কী কী কারণে এমন মনে হয় ?

হুমায়ূন আহমেদ : কখনো কখনো আমি এমন সব কাজ করি যে মনটা খুবই খারাপ হয়, তখন মনে হয় এই কাজটা কীভাবে করলাম ? কেন করলাম ?

ইমদাদুল হক মিলন : এটা কি রিসেন্ট কোনো ঘটনায় আপনার মনে হয়েছে! আপনার দ্বিতীয় বিয়ের ঘটনায় বা...

[ইন্টারভিউ নেওয়ার সময় যদি ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকের ব্যবস্থা থাকত তাহলে এ পর্যায়ে ব্যং করে একটা শব্দ হতো এবং টেনশন মিউজিক শুরু হতো।]

ইমদাদুল হক মিলন : প্রশ্নের জবাব দিতে না চাইলে দিতে হবে না।

হুমায়ূন আহমেদ : আমি যখন ইন্টারভিউ দিতে রাজি হয়েছি, তখন তোমার সব প্রশ্নেরই উত্তর দেব। মানুষ হিসেবে আমি কখনো নিজেকে অতি উচুস্তরের ভাবি আবার কখনো নিচুস্তরের ভাবি অনেক আগে থেকেই। দ্বিতীয় বিয়ের সঙ্গে এর সম্পর্ক নেই।

ইমদাদুল হক মিলন : আপনি বহু দিন ধরে টিভিতে, পত্র-পত্রিকায়, এমনকি কোনো অনুষ্ঠানেও যান না, এর কারণ কী ? আপনি কি এগুলো অ্যাভয়েড করতে চান ? আপনি বলছেন সব কিছু পরিষ্কার বলতে চান, কিন্তু আপনি তো বলেন না।

হুমায়ূন আহমেদ : শোনো, এ ধরনের প্রোগ্রামে যাওয়া বাদ দিয়েছি অনেক দিন হলো। একটা সময় ছিল, লেখালেখি জীবনের শুরুর কথা বলছি, যখন আগ্রহ নিয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যাওয়া-আসা করতাম। পত্রিকার অফিসে বসে থাকতাম। বাংলাবাজারের প্রকাশকদের শোরুমে সময় কাটাতাম। ওই সময়টা পার হয়ে এসেছি। আমার বয়সও হয়েছে। এসব ভালো লাগে না। ঘরে বসে থাকতে ভালো লাগে বেশির ভাগ সময়। তা ছাড়া হয়েছে কী, মানুষ তো গাছের মতো। গাছ কী করে ? শিকড় বসায়। প্রতিটি মানুষেরই শিকড় আছে। আমার দীর্ঘদিনের ব্যক্তিগত যে শিকড় আছে, সেগুলো ছিঁড়ে গেছে। আমি ফর ফাইভ ইয়ারস বাইরে বাইরে ঘুরেছি। কখনো মায়ের কাছে থেকেছি, কখনো হোটেলে থেকেছি, কখনো উত্তরায় একটি বাসা ভাড়া করে থেকেছি, কখনো বন্ধুর বাসায় থেকেছি, দখিন হাওয়ায় থেকেছি। যখন দখিন হাওয়ায় থাকতে শুরু করলাম তখনো সমস্যা। সপ্তাহের তিন দিন থাকি দখিন হাওয়ায়, চার দিন থাকি গাজীপুরে। প্রায়ই রাতে আমার ঘুমটা ভেঙে যায়। ঘুম ভেঙে গেলে মনে হয়, আমি এখন কোথায় ? ঢাকায় না গাজীপুরে ? একজন মানুষের শিকড় যখন ছিঁড়ে যায়, তখন তাকে অস্থিরতা পেয়ে বসে। এই অস্থিরতার

জন্যই বাইরে কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না। মনে হয়, নিজের মতো থাকি। ঘরে বসে থাকি, ছবি দেখি, গান শুনি। আমি এই বয়সে এসে এ রকম একটা সময় পার করছি। গর্তজীবী হওয়ার পেছনে এটাও হয়তো কারণ।

এখন নতুন শিকড় গজাচ্ছে। অস্থিরতা কমে আসছে। গর্ত থেকে বেরোতে শুরু করেছি। তোমাকে দীর্ঘ ইন্টারভিউ দিতে যে রাজি হলাম এটা কি তা প্রমাণ করে না ?

ইমদাদুল হক মিলন : আপনাকে অনেকে রুক্ষ মানুষ মনে করে, ভয় পায়। কিন্তু আপনার লেখা যারা পড়েছে তারা জানে যে, আপনি অসম্ভব মমতাবান একজন মানুষ। মানুষকে আপনি পছন্দ করেন।

হুমায়ূন আহমেদ : লেখা পড়ে তো একজন মানুষকে বিচার করা যায় না।

ইমদাদুল হক মিলন : অবশ্যই করা যায়। কেন যাবে না ? একজনের লেখা পড়ে আমরা কি বুঝতে পারব না, সে কোন ধরনের মানুষ এবং এটা আপনার তো বিশ্বাস করার কথা। একজন লেখক জীবনের নানা রকম কথা তাঁর লেখার বিভিন্ন চরিত্রের মধ্য দিয়ে বলেন।

হুমায়ূন আহমেদ : হেমিংওয়ের লেখা পড়ে আমরা কখনোই বুঝতে পারি না যে, হেমিংওয়ে নিজেকে গুলি করে মেরে ফেলতে পারেন। তিনি অসম্ভব জীবনবাদী একজন লেখক। তাঁর লেখা পড়ে যদি তাঁকে আমরা বিচার করতে যাই, তাহলে কিন্তু আমরা একটা ধাক্কা খাব। মায়কোভস্কি পড়ে কখনোই বুঝতে পারব না যে, মায়কোভস্কি আত্মহত্যা করার মানুষ। আমরা কাওয়াবাতা পড়ে কখনো বুঝতে পারব না যে, কাওয়াবাতা হারিকিরি করে নিজেকে মেরে ফেলবেন। এঁরা প্রত্যেকেই জীবনবাদী লেখক। জীবনবাদী লেখকদের পরিণতি দেখা গেল ভয়ংকর। তার মানে কী ? তার মানে কী দাঁড়ায় ? লেখকরা কি সত্যি সত্যি তাঁদের লেখায় নিজেকে প্রতিফলিত করেন ? নাকি তাঁদের শুদ্ধ কল্পনাকে প্রতিফলিত করেন ?

ইমদাদুল হক মিলন : ঘুরে ফিরে 'লীলাবতী'র প্রসঙ্গটায় আবার আসি। আপনার এ লেখাটা এমন আচ্ছন্ন করেছে আমাকে, এর আগে 'জোছনা ও জননীর গল্প' পড়ে এমন আচ্ছন্ন হয়েছিলাম। লীলাবতীতে মাসুদ নামের একটি ছেলে গোপনে এক সুন্দরী মেয়েকে বিয়ে করে ফেলেছে, পরীবানু যার নাম, আপনার মনে আছে নিশ্চয়ই। সে চরিত্রটা আবার আত্মহত্যা করল। আপনি মানুষকে এত নির্মমভাবে মেরে ফেলেন কেন আপনার লেখায় ?

হুমায়ূন আহমেদ : আমাদের জগতটা কিন্তু খুব নির্মম। এ জগতে মানুষ যখন মরে যায়, খুব স্বাভাবিকভাবেই সে মরে যায়। সৃষ্টিকর্তাও কিন্তু নির্মম। এই যে সুনামিতে দেড় লক্ষ দুই লক্ষ লোক মারা গেল, তিনি নির্মম বলেই তো এত লোক মারা গেল। এই নির্মমতাটা কিন্তু আমাদের মধ্যেও আছে। কথা নেই বার্তা নেই একজন গলায় দড়ি দিচ্ছে, হঠাৎ করে একজন ঘুমের বড়ি খেয়ে নিচ্ছে। যে ঘুমের বড়িটা খাচ্ছে, সে কিন্তু খুব আয়োজন করে খাচ্ছে তা না। মনে হলো খেয়ে নিল।

জীবনানন্দের সেই বিখ্যাত কবিতা, 'শোনা গেল লাশকাটা ঘরে নিয়ে গেছে তারে/ কাল রাতে—ফাল্গুনের রাতের আঁধারে/ যখন গিয়েছে ডুবে পঞ্চমীর চাঁদ/ মরিবার হলো তার সাধ/...বধূ শুয়ে ছিল পাশে—শিশুটিও ছিল/প্রেম ছিল, আশা ছিল/ জ্যোৎস্নায়,–তবু সে দেখিল কোন ভূত/ ঘুম ভেঙে গেল তার ? অথবা হয় নি তো ঘুম বহুকাল/ লাশকাটা ঘরে শুয়ে ঘুমায় এবার/ এই ঘুম চেয়েছিল বুঝি/ রক্তফেনা-মাখা মুখে/ মড়কের ইঁদুরের মতো ঘাড় গুঁজি/ আঁধার গুজির বুকে ঘুমায় এবার;/ কোনোদিন জাগিবে না আর/ কোনোদিন জাগিবে না আর/ জাগিবার গাঢ় বেদনার/ অবিরাম—অবিরাম ভার/ সহিবে না আর।' [এই পর্যায়ে আমি জীবনানন্দ দাশের দীর্ঘ কবিতার প্রায় সবটাই চোখ বন্ধ করে আবৃত্তি করলাম। কারণ ? আশপাশের সবাইকে জানান দেওয়া যে, আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা কবিতা মুখস্থ বলতে পারি। মিলনকে সামান্য ভড়কে দেওয়ার ইচ্ছাও যে ছিল না, তা না।]

ইমদাদুল হক মিলন : এই 'লীলাবতী' উপন্যাসটা আপনি জীবনানন্দকে উৎসর্গ করেছেন। উৎসর্গের ভাষাটা হচ্ছে এ রকম—তিনি জীবিত, আপনি কবির উদ্দেশে বলছেন, কবি, আমি কখনো গদ্যকার হতে চাই নি। আমি আপনার মতো একজন হতে চেয়েছি। হায়, এত প্রতিভা আমাকে দেওয়া হয় নি।

হুমায়ূন আহমেদ : জীবনানন্দ দাশের কবিতা যখন পড়ি, তখন মনে হয় কবি যেন পাশেই আছেন। আমি যখন গভীর আগ্রহ নিয়ে তাঁর কবিতাটি পাঠ করছি তিনি সেটা শুনতে পাচ্ছেন। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও আমার এই ব্যাপারটি ঘটে। যখন রবীন্দ্রসাহিত্য পড়ি, তখন মনে হয়, তিনি বুঝি আশপাশেই আছেন। অল্প কিছুদিন আগে বিভূতিভূষণের 'কিন্নরদল' গল্পটি পড়ছিলাম...

ইমদাদুল হক মিলন : হ্যাঁ, এটা আপনার খুব প্রিয় একটা গল্প...

হুমায়ূন আহমেদ : আমি যখন গল্পটি পড়ছি, তখন আমার মনে হলো, তিনি আমার পাশেই আছেন। গল্পটি পড়ে আমি আনন্দ পাচ্ছি এবং সেই আনন্দটা তিনি বুঝতে পারছেন। এটা আমার ছেলেমানুষি হতে পারে। কিন্তু এই অনুভূতিটা আমার প্রায়ই হয়। যেকোনো ভালো লেখা পড়ার সময়ই আমার মনে হয় লেখক আমার পাশে আছেন।

ইমদাদুল হক মিলন : আপনার লেখা পড়তে পড়তে আমার মনে হয়, ধরেন আপনি লিখছেন, কিন্তু এর পরে কোন লাইনটা লিখবেন আপনি জানেন না ?

হুমায়ূন আহমেদ : কিছু কিছু লেখক আছেন, যাঁরা প্রতিটি লাইন খুবই চিন্তাভাবনা করে লেখেন। আবার একধরনের লেখক আছেন, স্বতঃস্ফূর্ত লেখক। মাথায় যেটা আসবে সেটা লিখবে। আমার লেখার ওপর খুব একটা কন্ট্রোল আছে—তা না, কন্ট্রোল আছে হালকা, আমার মনে হয় যে আমার মধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে লেখাটা বেশি কাজ করে। কিন্তু আমি যখন 'জোছনা ও জননীর গল্প' লিখেছি তখন কোন লাইনের পর কোন লাইন লিখব আমি জানি। আমি যখন মিসির

আলী লিখি তখন কিন্তু আমি জানি এই লাইনটার পরে আমি কোন লাইন লিখব। সায়েন্স ফিকশন লেখার সময় আমি জানি কোন লাইনটা লিখব। ওই বাকি লেখাগুলোর সময় আমার আর কন্ট্রোল থাকে না।

ইমদাদুল হক মিলন : 'লীলাবতী' লেখার সময় জানতেন ?

হুমায়ূন আহমেদ : না।

ইমদাদুল হক মিলন : 'লীলাবতী'র একটা ছোট চরিত্রের কথা বলি, চঞ্চলী, সে রমিলার বোন। রমিলা মাঝে মাঝে বলে আমি পানিতে ডুবে গেলাম। আমার বোন আমার জন্য ঝাঁপ দিল, আমি উঠে গেলাম কিন্তু সে আর উঠল না। সে এখন সব সময় আমার সঙ্গে থাকে। মাগো, এই জন্য আমি তোমার সঙ্গে ঢাকায় যাব না। এই যে চরিত্রটা, আপনি জেনেই লিখেছেন নাকি হঠাৎ ?

হুমায়ূন আহমেদ : হ্যাঁ হঠাৎ...হঠাৎ করেই মাথায় এসেছে, আবার হঠাৎ করেই চলে গেছে। চলে গেছে যখন এটা নিয়ে পরে আর মাথা ঘামাই নি। যেমন দীঘির জলে একটা মাছের লেজ ভেসে উঠল। জলে ঘাই দিয়ে তলিয়ে গেল।

ইমদাদুল হক মিলন : এটি ১৩৫৭ সালের পটভূমিতে লেখা উপন্যাস, এখানে আনিস চরিত্রটা কতটুকু যৌক্তিক বলে মনে হয়েছে ?

[বুঝতে পারছি মিলন এখন প্রমাণ করার চেষ্টা করবে যে, আনিস চরিত্রটি যৌক্তিক না। আমাকে এই মুহূর্তে কঠিন অবস্থানে যেতে হবে। দেরি করা যাবে না।]

হুমায়ূন আহমেদ : (কঠিন গলা) মিলন যথেষ্ট হয়েছে। রেকর্ডার বন্ধ কর। চা খাও। আজকের মতো এখানেই ইতি।

[মিলন রেকর্ডার বন্ধ করল। আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। হাত বাড়িয়ে আমার ডান হাত শক্ত করে চেপে ধরল। অনেক দিন আগের একটি স্মৃতি আমার মনে পড়ল। তখন শ্যামলীর এক ভাড়া বাড়িতে থাকি। আমার হয়েছে ভয়াবহ জন্ডিস। মিলন প্রচুর ফলমূল নিয়ে আমাকে দেখতে এসেছে। তার মাথাটা পরিষ্কার করে কামানো। তাকে অদ্ভুত দেখাচ্ছে। সে আমার বিছানার পাশে বসল। শক্ত করে আমার হাত চেপে ধরল। মুখে কিছুই বলল না। এভাবে সে বসে থাকল দীর্ঘ সময়। ভাব প্রকাশের ব্যাপারটা লেখকদের চেয়ে ভালো কেউ জানেন না। কিন্তু গভীর আবেগের সময় যে তারা কিছুই বলেন না—এই তথ্য কি সবাই জানে ?

অনেক বছর আগে আমার হাত চেপে ধরে মিলন যে আবেগ প্রকাশ করেছিল, আজও সে তাই করল। হাত সে ধরে আছে ধরেই আছে, কিছুতেই ছাড়ছে না। আমি এত ভাগ্যবান কেন ? মানুষের এত ভালোবাসা কেন আমার জন্য ? আমার ঘরভর্তি চাঁদের আলো। এই আলো আমি কোথায় রাখব ?]

হুমায়ূন আহমেদের সাক্ষাৎকার

ইমদাদুল হক মিলন : আপনার মনে হয় নি যে *লীলাবতী* উপন্যাসের শেষটা আপনি খুব দ্রুত করেছেন ? শেষটা আরেকটু বিস্তৃত হতে পারত ?

হুমায়ূন আহমেদ : আমার বেশির ভাগ উপন্যাসে আমি শেষের দিকে এসে তাড়াহুড়া করি। কেন করি তোমাকে ব্যাখ্যা করি—তুমি তো লেখক মানুষ, তুমি বুঝবে। লেখক যখন লেখালেখি করেন, লেখার আগে থেকে পুরো উপন্যাসটা তাঁর মাথার ভেতর ঢোকে। আমি একটা ৫০০ পৃষ্ঠার উপন্যাস লিখলাম, ৫০০টা পৃষ্ঠা কিন্তু আমি তখন মাথার ভেতর নিয়ে বাস করছি। তখন একটা চেষ্টা থাকে, কত তাড়াতাড়ি আমি জিনিসটাকে মাথা থেকে নামিয়ে দেব। আমি প্রবল চাপ নিয়ে হাঁটাহাঁটি করি, একই সঙ্গে আমার মাথার ভেতর ৫০০ পৃষ্ঠার উপন্যাস হাঁটাহাঁটি করে। উপন্যাসের চরিত্রগুলো কুটুরকুটুর করে নিজেদের মধ্যে কথা বলে, ব্যাপারটা একই সঙ্গে আনন্দের ও প্রচণ্ড চাপের। আমার মনে হয়, একজন গর্ভবতী মা ৯ মাস গর্ভধারণের পর সন্তানের জন্ম দিয়ে যে আনন্দ-তৃপ্তি-স্বস্তিটা পান, একজন লেখক ঠিক সেই স্বস্তিটা পান। সেই স্বস্তিটার জন্য আমার তাড়াহুড়া। আল্লাহপাক হয়তো এ কারণেই কোরআন শরিফে বলেছেন, 'হে মানবসন্তান, তোমাদের বড়ই তাড়াহুড়া।'

ইমদাদুল হক মিলন : আবার *লীলাবতী* প্রসঙ্গে আসি। মাসুদের স্ত্রীর যখন বাচ্চা হবে, সে বাড়িতে থাকল, তার বাচ্চা হচ্ছে না। তার শাশুড়ি আগেই বলেছিল, তার যমজ বাচ্চা হবে। একটা ছেলে, একটা মেয়ে। তারপর নৌকা করে সে যাচ্ছে, ঝড়বৃষ্টি হচ্ছে, সেখানে তার যমজ বাচ্চা হলো। এই যে এটুকু রহস্য, তাকে আপনি ঝড়-জলের মধ্যে কেন নিয়ে এলেন ? রহস্যটা কী ? এই কষ্টটা সে তো বাড়িতেও পেতে পারত ?

হুমায়ূন আহমেদ : নৌকায় পরীবানুকে নিয়ে, তাকে ঝড়বৃষ্টির হাতে ছেড়ে দিয়ে যে টেনশন তৈরি হয়েছে, পরীবানুকে বাড়িতে রেখে দিলে তা হতো না।

ইমদাদুল হক মিলন : আমি সাহিত্যের যেটুকু বুঝি, তাতে জানি যে আপনি খুব বড় একজন লেখক। অন্য ভাষায় অন্য দেশে জন্মালে হয়তো আপনি আরও ভাগ্যবান হতেন। দুর্ভাগ্য আপনার, আপনি এই ভাষার, এই দেশে জন্মে গেছেন। আপনার কী মনে হয়, বাংলা ভাষার প্রেক্ষাপটে ঔপন্যাসিক হিসেবে আপনার অবস্থানটা কোথায় ?

হুমায়ূন আহমেদ : আমার অবস্থান আমাকেই ঠিক করতে হবে ? মিলন, শোনো, আমি সাহিত্যের ছাত্র না। আমি কেমিস্ট্রির ছাত্র। সাহিত্যের বিষয়ে আমার যে জ্ঞান, সেটা হচ্ছে বই পড়ে। এক জীবনে প্রচুর বই পড়েছি। আমাদের সময় তো রেডিও, টিভি—এসব ছিল না; আমাদের একমাত্র জিনিস ছিল গল্পের বই। বিশাল বিশাল উপন্যাস, যেটা আমাদের অল্পবয়সীদের পড়তে দেওয়া হতো না। যেমন ধরো, 'কড়ি দিয়ে কিনলাম', খাটের নিচে ঢুকে অন্ধকারে পড়ে শেষ করেছি। আমার সাহিত্য সম্পর্কে যা জ্ঞান আছে, ওই খাটের নিচে ঢুকে বই পড়ে। এমন একজনকে কি সাহিত্যে তার অবস্থান বিষয়ে কিছু জিজ্ঞেস করা ঠিক ?

ইমদাদুল হক মিলন : হুমায়ূন ভাই, আমি জানতে চাইছিলাম যে আপনি এত বড় একজন লেখক, বাংলা সাহিত্যের প্রেক্ষাপটে আপনার নিজের অবস্থানটা কোথায় ?

হুমায়ূন আহমেদ : প্রশ্নের উত্তর নিয়েই ছাড়বে ? আমার অবস্থান ঠিক হবে আমার মৃত্যুর পর। তোমরা সবাই মিলেই ঠিক করবে। এই সময়ে আমি বর্তমানের একজন জনপ্রিয় লেখক। এর বেশি কিছু না।

ইমদাদুল হক মিলন : এখানে একটা কথা বলি, যে অবস্থায় হেমিংওয়ে তাঁর জীবদ্দশায় পপুলার, জীবদ্দশায় মার্কেজ পপুলার, জন স্টাইনবেক পপুলার, তাঁদের মতো লেখক সারা পৃথিবীতে বিরল আর আমাদের সাহিত্যে শরৎচন্দ্র জনপ্রিয়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বনফুল—এঁরা জনপ্রিয়। এখন এসব লেখকের জনপ্রিয়তার পার্থক্য আছে। আমি বাংলা ভাষায় জনপ্রিয়তার কথা বললে তারাশঙ্করকে বলব। তাঁর সময়ে তাঁর মতো জনপ্রিয় আর কেউ নেই। জনপ্রিয়তার কথা বললে আপনাকে তো কেউ রোমেনা আফাজের সঙ্গে তুলনা করে না, আপনাকে তুলনা করলে তারাশঙ্করের সঙ্গে তুলনা করে, শরৎচন্দ্রের জনপ্রিয়তার সঙ্গে করে।

হুমায়ূন আহমেদ : মিলন, শোনো, বাংলাদেশে সাহিত্যের থার্মোমিটার হলেন সাহিত্যের অধ্যাপকরা। এ দেশে পাঠকদের ভালোলাগা-মন্দলাগা গ্রাহ্য হয় না। সাহিত্যের অধ্যাপকদের থার্মোমিটারে কী উঠছে, সেটাই গ্রাহ্য। সাহিত্যের থার্মোমিটার বলছে, আমি একজন জনপ্রিয় লেখক। এর বেশি কিছু না। কাজেই এটাই সত্য। আমার মৃত্যুর পর নতুন সত্য আসতে পারে, আবার নাও পারে। না এলে নাই। সাহিত্যের অধ্যাপকরা সাহিত্য মাপার নানা যন্ত্রপাতি—থার্মোমিটার, ল্যাকটোমিটার নিয়ে বসে থাকুক। আমি বসে থাকব বলপয়েন্ট নিয়ে। মিলন, ল্যাকটোমিটার কী জানো তো ? ল্যাকটোমিটার দিয়ে দুধের ঘনত্ব মাপা হয়। সাহিত্যের সমালোচকদের হাতেও কিন্তু সাহিত্যের ঘনত্ব মাপার ল্যাকটোমিটার আছে। হা হা হা।

বাংলাদেশের একজন সাহিত্যবোদ্ধা আমার উপন্যাসগুলোর জন্য একটা নাম বের করেছিলেন, সেটা তোমার মনে আছে ? 'অপন্যাস'।

ভাগ্যিস তার পরই কলকাতার *দেশ* পত্রিকা আমার 'অপন্যাস' ছাপতে শুরু করল। আমাদের দেশের সাহিত্যবোদ্ধাদের কাছে ওই পত্রিকাটি হিসাবের পত্রিকা।

ইমদাদুল হক মিলন : হ্যাঁ, এটা বাংলা ভাষার কোনো লেখকের ক্ষেত্রে ঘটে নি। প্রতিবছর শারদীয় সংখ্যায় বাংলা ভাষার কোনো লেখকের উপন্যাস ছাপা হওয়া *দেশ*-এর ইতিহাসে নেই।

হুমায়ূন আহমেদ : থাকুক ওই প্রসঙ্গ। শারদীয় *দেশ* আমার উপন্যাস ছেপেছে বলে আমি জাতে উঠে গেছি, এটা আমি মনে করি না। আমি লেখালেখি আমার আনন্দের জন্য করি, জাতে ওঠার জন্য করি না। জাতিচ্যুত হওয়ার জন্যও করি না।

ইমদাদুল হক মিলন : আপনি তো প্রচণ্ড আত্ম-অহংকারী লোক!

হুমায়ূন আহমেদ : আমি চোখমুখ শক্ত করে থাকি বলে আমাকে অহংকারী মনে হয়। তবে কিছু অহংকার আছে। সেই অহংকার নিজেকে ভালো মানুষ ভাবার অহংকার। এর বেশি না।

ইমদাদুল হক মিলন : আপনার প্রথম উপন্যাস 'নন্দিত নরকে' প্রকাশিত হওয়ার পর বাংলা ভাষার খুব বড় ঔপন্যাসিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বইটি নিয়ে 'দেশ' পত্রিকায় লিখলেন। ওটা একটা অসাধারণ রচনা। আমার এখনো মনে আছে। আপনার বইয়ের ভূমিকা লিখলেন আহমদ শরীফ এবং বাংলাদেশের যত বুদ্ধিজীবী আছেন সবাই আপনার প্রশংসা করেছিলেন এই লেখার জন্য। এরপর ড. আনিসুজ্জামান আপনার বইয়ের ভূমিকা লিখে দিলেন। শামসুর রাহমান আপনার লেখার ব্যাপক প্রশংসা করে লিখেছেন এবং বাংলা ভাষার খুব বড় লেখক আমি মনে করি তাঁকে, জানি না আপনি আমার সঙ্গে একমত হবেন কি না—তাঁর নাম রমাপদ চৌধুরী, তিনি আপনার লেখা সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত চিঠিপত্র লিখেছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে আমার একবার কথাও হয়েছিল কলকাতায়। সব কিছু মিলিয়ে আপনার এ ধারণাটা কেন হলো যে এ দেশের দু-একজন কী বললেন না বললেন তার ওপর আপনাকে নির্ভর করতে হবে বা আপনি খুব আশান্বিত হবেন তাঁদের কথায়?

হুমায়ূন আহমেদ : মিলন, আমি যে সময়ের কথা বলেছি, সে সময়...।

ইমদাদুল হক মিলন : না, তার আগে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বা আহমদ শরীফের মতো লেখকরা আপনাকে নিয়ে লিখেছেন। শওকত আলী আপনাকে নিয়ে লিখেছেন।

হুমায়ূন আহমেদ : মানুষের মন খারাপ হয় না? কত আগ্রহ, কত আনন্দ নিয়ে লিখি! কত না বিনিদ্র রজনীর লেখাকে অপন্যাস বলা হচ্ছে, একথা মনে লাগবে না? লেখকরা তো আবেগের সমুদ্রেই লালিত-পালিত।

ইমদাদুল হক মিলন : জনপ্রিয় লেখকের কনসেপ্টটা আসলে কী আপনার কাছে? আপনি আমাকে একটু পরিষ্কার করে বলেন তো...।

হুমায়ূন আহমেদ : তুমি দেখি এক 'জনপ্রিয়' নিয়ে ঘটঘট করেই যাচ্ছ ? ব্যাপারটা কী ? জনপ্রিয় লেখকের কনসেপ্ট একটাই—বহু লোক তাঁর বই পড়ছে।

ইমদাদুল হক মিলন : এখন বহু লোক তো মার্কেজের বইও পড়ছে, তারাশঙ্করের বইও পড়ছে, হুমায়ূন আহমেদের বইও পড়ছে, আবার এদিকে রোমেনা আফাজ বা এজাতীয় লেখকের বইও পড়ছে। সে ক্ষেত্রে ব্যাপারটা কী রকম দাঁড়ায় ?

হুমায়ূন আহমেদ : শোনো মিলন, এত প্যাঁচালের মধ্যে যেতে চাইছি না। এখন আমার কাছে জনপ্রিয় শব্দটা খুব প্রিয়।

ইমদাদুল হক মিলন : প্রিয় শব্দ ?

হুমায়ূন আহমেদ : কারণ জনপ্রিয় শব্দটার প্রথম শব্দ হলো 'জন', যেখানে জনতা আছে, সেখানে সেই শব্দটাকে আমি ক্ষুদ্র করে দেখব, আমি ওই রকম লোকই না। আমাদের হেমন্তের গান শুনতে ভালো লাগে না ?

ইমদাদুল হক মিলন : হ্যাঁ, অবশ্যই।

হুমায়ূন আহমেদ : কত দরদি একজন গায়ক হেমন্ত মুখোপাধ্যায়! এখন বহু লোক তাঁর গান শোনে বলে কি তিনি ছোট হয়ে গেছেন ?

ইমদাদুল হক মিলন : না, এখানে কি হুমায়ূন ভাই আপনার মনে হয় জনপ্রিয়তার দুটি ভাগ আছে ? ধরেন যে অর্থে মার্কেজ বা তারাশঙ্কর জনপ্রিয়, যে অর্থে আপনি জনপ্রিয়, সেই অর্থে ফুটপাতের চটিবই লেখা একজন জনপ্রিয় লেখক, এ বিষয়ে আপনার ব্যাখ্যাটা কী ?

হুমায়ূন আহমেদ : আসলে ব্যাপার হলো, জনতার কোন অংশ বইটি পড়ছে।

ইমদাদুল হক মিলন : আমি সেটাই জানতে চাইছি। আমি বিষয়টা একটু ক্লিয়ার করে দিই আপনাকে। ধরেন হেমিংওয়ে বা মার্কেজের জনপ্রিয়তা, তারাশঙ্কর বা বিভূতিভূষণের যে জনপ্রিয়তা আর ওদিকে নীহাররঞ্জন গুপ্ত। আপনার জায়গাটা কোথায় আসলে ?

হুমায়ূন আহমেদ : ভালো যন্ত্রণায় পড়লাম তো। মিলন, শোনো, একটা সময় ছিল, যখন এইসব তুচ্ছ বিষয় নিয়ে আমি মাথা ঘামাতাম। এখন মাথা ঘামাই না। এখন মনে হয়, তোমাদের যা ইচ্ছা তোমরা বলো, আমার উপন্যাসকে 'অপন্যাস' বলো, আমার কিছু যায়-আসে না। আমার প্রধান কাজ হচ্ছে লেখালেখি করে যাওয়া, এ কাজটি আমি যদি আমার মৃত্যুর আগের মুহূর্ত পর্যন্ত করে যেতে পারি, আমি মনে করব, এটা আমার জন্য যথেষ্ট। এবং আমি খুবই ভাগ্যবান লেখক যে আমি আমার বইগুলো অনেককেই পড়াতে পারছি। একটা প্রত্যন্ত গ্রামের কোনো বাড়িতে ঢুকে যখন দেখি ওই বাড়িতে চার-পাঁচটা বই আছে, এর মধ্যে একটা নিয়ামুল কোরআন আছে, একটা 'বিষাদসিন্ধু' আছে আর একটা হুমায়ূন আহমেদের বই—আমার যে কী আনন্দ হয়! চোখে পানি এসে যাওয়ার মতো আনন্দ।

২

ইমদাদুল হক মিলন : বাংলা ভাষার খুব জনপ্রিয় লেখক হচ্ছেন শরৎচন্দ্র, তারপর তারাশঙ্কর। কিন্তু যে অর্থে জনপ্রিয়তাকে আমাদের দেশে বিবেচনা করা হয়, এঁরা সেই স্তরের লেখক না এবং আমরা সেই সারিতে আপনাকে অনেক আগেই যুক্ত করেছি। আপনার কি মনে হয় ?

হুমায়ূন আহমেদ : আমার কিছু মনে হয় না, মিলন। আমি এটা আগেও বলেছি। তবে শোনো, আমাদের দেশের লেখকদের ভাগ্য খুবই খারাপ। শুধু লেখালেখি করে আমাদের লেখকরা জীবিকা নির্বাহ করতে পারেন না। সেখানে আমার যে অবস্থানটা হয়েছে, মাঝেমধ্যে আমার কাছে খুবই বিস্ময়কর মনে হয়। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন অধ্যাপনা করি, মাসে ছয় হাজার-সাড়ে ছয় হাজার টাকা পাই, থাকি শহীদুল্লাহ হলে। হঠাৎ করে দেখলাম, লোকজন আমার বই পড়া শুরু করেছে। আমি কী করলাম ? মাথা খারাপ থাকলে যা হয় আর কি! সব কিছু বাদ দিয়ে একটা গাড়ি কিনে ফেললাম।

ইমদাদুল হক মিলন : কিনলেন কি, ওটা তো ছিল একটা গিফট। ওটা আপনাকে উপহার দিয়ে গেল এক প্রকাশক। এ ধরনের ঘটনা বাংলা সাহিত্যে কোনো লেখকের ক্ষেত্রে কখনো ঘটে নি।

হুমায়ূন আহমেদ : এটা ইন্টারেস্টিং ঘটনা ছিল। কিন্তু ইন্টারেস্টিং ঘটনার এখানেই শেষ না। আট মাসের মাথায় আরও বেশি টাকা হয়ে গেল। আমি কিনে ফেললাম মাইক্রোবাস। আমার মাইক্রোবাসের তো তখন দরকার নেই। কেন কিনলাম ? এটার কোনো লজিক্যাল কারণ থাকতে পারে ? কোনো কারণ নেই, কিন্তু আমার গাড়ি রাখার জায়গা নেই। হলের ভেতরও তো জায়গা নেই। একটা ছোট গাড়ি, আবার একটা মাইক্রোবাস বাসার সামনে পড়ে থাকে। আমার দেখতে খুবই ভালো লাগে। মাঝেমধ্যে মাইক্রোবাসের দরজা খুলে রাতে মাইক্রোবাসে চুপচাপ গিয়ে বসা। এর চেয়ে হাস্যকর কিছু হতে পারে ? একজন লেখকের পক্ষেই এ রকম হাস্যকর জিনিস করা সম্ভব। একজন লেখকের চারটি গাড়ি। একটা পর্যায়ে আমার গাড়ি ছিল চারটি। চারটি গাড়ির দরকার নেই আমার। কিন্তু ড্রাইভার আমার একটি। একটি লোক যে চারটি গাড়ি কিনবে তাঁর চারটি ড্রাইভার থাকবে বা তিনটি ড্রাইভার থাকবে। চারটি গাড়ি নিয়ে আমি বসে আছি, আমার ড্রাইভার কিন্তু একজন। চারটি গাড়ি কেন কিনলাম ? এগুলো করার সুযোগ করে দিয়েছে আমার বইগুলো। আমার নানা ধরনের পাগলামি পূরণ করতে পারছি কী জন্য ? মানুষজন আমার বই পড়ছে বলে। এই যে আমি সেন্টমার্টিনে একটি বাড়ি কিনে রেখেছি, কেন ? নুহাশপল্লী বানিয়ে রেখেছি, কেন ?

ইমদাদুল হক মিলন : তার মানে, আপনার মনে হয় আপনার মধ্যে পাগলামি আছে ?

হুমায়ূন আহমেদ : আমার মধ্যে পাগলামি আছে।

ইমদাদুল হক মিলন : এটা কি আপনার বাবার মধ্যেও ছিল ? আমি যত দূর জানি, আপনার বাবা, আপনি 'আমার ছেলেবেলা' বইতে লিখেছিলেন যে তিনি এক মাসের বেতন পেয়ে একটি ঘোড়া কিনে নিয়ে এসেছিলেন।

হুমায়ূন আহমেদ : ঘোড়া কিনে এনেছিলেন, বেহালা কিনে এনেছিলেন।

ইমদাদুল হক মিলন : আপনার বাবার ঘোড়া কেনার সঙ্গে আপনার মাইক্রো কেনার কোনো যোগসূত্র আছে ?

হুমায়ূন আহমেদ : ভালোই তো মিলিয়েছ। শুধু ঘোড়া না, বাবা তাঁর বেতনের টাকায় বেহালাও কিনেছিলেন। সেই সময় উনি বেতন পেতেন আশি টাকা। বেহালাটা কিনেছিলেন পঁচিশ টাকা দিয়ে। ওটা কেনা মানে ওই সময় বেতনের অনেকটাই চলে যাওয়া। খুবই দামি একটি বেহালা। এই বেহালাটা তিনি তাকের ওপরে উঠিয়ে রেখে দিলেন। আমাদের নাগালের বাইরে রেখে দিলেন। কী জন্য বেহালাটা কিনলেন ? কোনো একসময় তিনি একজন ওস্তাদ পাবেন বেহালার, তখন তিনি শিখবেন। তাই আগে থেকে কিনে বসে আছেন। সেই ওস্তাদও পাওয়া গেল না। হয়তো বা পাওয়া গেল, শেখার পয়সাটা জোগাড় করতে পারলেন না। তাঁর বেহালা শেখা হলো না। একটা পর্যায়ে বেহালাটা তাকের ওপর থেকে নামিয়ে আমরা ভাইবোনরা কিছুক্ষণ পোঁ পোঁ করে বাজাতাম, তারপর উঠিয়ে রাখতাম, বাবা যাতে টের না পান।

ইমদাদুল হক মিলন : আপনার লেখালেখির মধ্যে পাঠকরা একধরনের পাগলামির প্রকাশ দেখতে পায়, এর কারণটা কী ?

হুমায়ূন আহমেদ : মিলন, তুমি এখন আমাকে দিয়ে বলানোর চেষ্টা করছ যে আমি পাগল। পাগল বলেই লেখায় পাগলামি উঠে আসে। আচ্ছা, যাও আমি পাগল। কি, তুমি খুশি তো ? আর বকবক করবে না। স্টপ।

ইমদাদুল হক মিলন : আপনি বললে স্টপ।

(ইন্টারভিউ বন্ধ হলো। হুমায়ূন আহমেদ তাঁর তোলা ফটোগ্রাফের স্তূপ নিয়ে বসলেন। একেকটা ছবি হাতে নিচ্ছেন এবং ব্যাখ্যা করছেন। আমি বললাম, আপনার ছবির চেয়ে ব্যাখ্যা সুন্দর। হুমায়ূন আহমেদ বললেন, যাও, তোমাকে আর ছবি দেখাব না।)

ইমদাদুল হক মিলন : লেখাপড়ার প্রসঙ্গে আসি। আপনি একবার বলেছিলেন আপনি লেখাপড়ায় মনোযোগী ছিলেন না।

হুমায়ূন আহমেদ : না, ছিলাম না। ছোটবেলায় একেবারেই ছিলাম না। পড়াশোনায় আমার মন বসে অনেক পরে। স্কুলের সব পরীক্ষায় টেনেটুনে পাস করতাম। ক্লাস সিক্সে (চিটাগাং কলেজিয়েট স্কুল) ফেল করি। আমাদের ক্লাস টিচার বড়ুয়া স্যার আমার কান্নায় দ্রবীভূত হয়ে বিশেষ বিবেচনায় পাস করিয়ে দেন।

ইমদাদুল হক মিলন : পড়াশোনায় আপনার মন বসল কখন ?

হুমায়ূন আহমেদ : তখন ক্লাস এইটে পড়ি। বৃত্তি পরীক্ষা হবে। ভালো ছাত্ররা বৃত্তি পরীক্ষার জন্য সিলেক্ট হয়েছে। তাদের বিশেষ যত্ন। ডাবল টিফিন পায়। যেহেতু বৃত্তি দিচ্ছে, তাদের ফাইনাল পরীক্ষাও দিতে হবে না। আমার খুব...

ইমদাদুল হক মিলন : আপনার চাকরিজীবনের কথা বলুন। প্রথমেই কি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে জয়েন করলেন ?

হুমায়ূন আহমেদ : না। প্রথমে জয়েন করলাম ময়মনসিংহের অ্যাগ্রিকালচারাল ইউনিভার্সিটিতে। সেখানে মাস চার-পাঁচ মাস্টারি করার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিই।

ইমদাদুল হক মিলন : ময়মনসিংহের সময়টা আপনার কেমন কেটেছে ?

হুমায়ূন আহমেদ : খুব খারাপ। যদিও ময়মনসিংহ আমার নিজের জেলা। ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে একটি বাসা ভাড়া করে থাকতাম। মনে হতো নির্বাসনে এসেছি। সহকর্মীদের কারও সঙ্গই পছন্দ হতো না। তাঁদের চিন্তাভাবনা স্থূল মনে হতো। তাঁদের দেখে মনে হতো তাঁদের জীবন ক্লাস নেওয়া এবং ক্লাস থেকে ফিরে দুপুরে খেয়ে ঘুমানোর মধ্যেই আটকে গেছে।

ইমদাদুল হক মিলন : আপনার সময় কাটত কীভাবে ?

হুমায়ূন আহমেদ : ব্রহ্মপুত্র নদের পাড়ে হাঁটাহাঁটি করে। রাতে লিখতাম। 'অচিনপুর' নামের উপন্যাসটি ময়মনসিংহে লেখা শুরু করি।

ইমদাদুল হক মিলন : তার আগেই তো আপনার *নন্দিত নরকে* ও *শঙ্খনীল কারাগার* প্রকাশিত হয়ে গেছে।

হুমায়ূন আহমেদ : হ্যাঁ।

ইমদাদুল হক মিলন : আচ্ছা, এই যে *নন্দিত নরকে* লেখা হলো একেবারে হঠাৎ করে' তার আগে *নন্দিত নরকে*-তে একটা ভূমিকা ছিল, সোমেন চন্দরের একটা গল্প 'ইঁদুর' আপনাকে প্রভাবিত করেছিল—কিন্তু কথা সেটা না, কথা হলো ছেলেবেলায় পাঠ্যপুস্তকের বাইরে বই পড়ার অভ্যাসটা আপনার কীভাবে হলো ?

হুমায়ূন আহমেদ : ভূমিকাটা ছিল *শঙ্খনীল কারাগারে*। আর বই পড়ার অভ্যাসের কথা বলছ ? এই অভ্যাস পেয়েছি বাবার কাছ থেকে। তাঁর খুব পড়ার শখ ছিল। বাড়ি ভর্তি ছিল বইয়ে। তিনি লেখালেখিও করতেন। তাঁর একটি গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। নাম *দীপ নেভা যার ঘরে*। তাঁর লেখা কলকাতার কিছু পত্রিকা, এ দেশের *দৈনিক আজাদ*-এ ছাপা হতো। লেখালেখি করে কলকাতার কোনো এক প্রতিষ্ঠান থেকে তিনি 'সাহিত্য সুধাকর' উপাধিও পেয়েছেন। সেই সময়ের লেখকরা নানা উপাধি পেতেন।

ইমদাদুল হক মিলন : আপনার 'নন্দিত নরকে' লেখা কি একেবারেই আচমকা ? এর আগে আপনি কি কিছু লিখেছেন কখনো ?

হুমায়ূন আহমেদ : কবিতা লিখেছি। 'দৈনিক পাকিস্তান' পত্রিকায় ছাপাও হয়েছে। তবে নিজের নামে লিখি নি। কবিতাগুলো আমার ছোট বোন মমতাজ আহমেদ শিখুর নামে পাঠাতাম। তার নামেই ছাপা হতো।

ইমদাদুল হক মিলন : ছোট বোনের নামে পাঠাতেন কেন ? নিজের নামে নয় কেন ?

হুমায়ূন আহমেদ : কবিতাগুলো তেমন সুবিধার ছিল না। পুরুষ কবির কবিতা হিসেবে চলে না। মহিলা কবির কবিতা হিসেবে চলতে পারে।

ইমদাদুল হক মিলন : মহিলাদের সৃষ্টিশীলতাকে আপনি কি ছোট করে দেখছেন না ?

হুমায়ূন আহমেদ : মিলন, তুমি বাংলা ভাষার দশজন মহিলা কবির নাম বলো, যাঁরা পুরুষদের পাশে দাঁড়াতে পারেন।

ইমদাদুল হক মিলন : আপনার ছোট বোনের নামে প্রথম যে কবিতাটি ছাপা হয় তার নাম কী ?

হুমায়ূন আহমেদ : দিতে পার একশ ফানুস এনে/আজন্ম সলজ্জ সাধ, একদিন আকাশে কিছু ফানুস উড়াই।

ইমদাদুল হক মিলন : এটা তো মুক্তিযুদ্ধের আগে ?

হুমায়ূন আহমেদ : হ্যাঁ, মুক্তিযুদ্ধের আগে।

ইমদাদুল হক মিলন : তার পরে এভাবে ক'টা কবিতা পত্রিকায় ছাপানো হয়েছিল, আপনার মনে আছে ?

হুমায়ূন আহমেদ : পাঁচটি কবিতা।

ইমদাদুল হক মিলন : তারপর আপনি উপন্যাস লিখলেন ?

হুমায়ূন আহমেদ : নাহ্, উপন্যাসটা অনেক পরে...।

ইমদাদুল হক মিলন : উপন্যাসে আসার ঘটনাগুলো বলেন, এই ধরেন—কীভাবে শুরু, কীভাবে আইডিয়াটা এল মাথায়...

হুমায়ূন আহমেদ : প্রথমে তো আমি লিখলাম 'শঙ্খনীল কারাগার'। যদিও প্রথমে এটা ছাপা হয় নি, কিন্তু উপন্যাস প্রথমে লেখা হয়েছিল 'শঙ্খনীল কারাগার'। কিছুই করার ছিল না সেই সময়। আমার ঠিকমতো মনেও নেই। তবে এই উপন্যাসটা আমার বাবা পড়েছেন—এটা আমার জন্য খুবই আনন্দের একটা ঘটনা।

ইমদাদুল হক মিলন : মানে, আপনার হাতে লেখা কপিটাই পড়েছেন ?

হুমায়ূন আহমেদ : হ্যাঁ।

ইমদাদুল হক মিলন : পড়ে কী বললেন ?

হুমায়ূন আহমেদ : আমাকে কিছু বললেন না। বাবার সঙ্গে আমাদের ভাইবোনদের দূরত্ব ছিল। বাবা সরাসরি আমাদের কিছু বলতেন না। ভায়া মিডিয়া কথা বলতেন। তাঁর যা বলার তিনি মাকে বলতেন, মা আমাদের বলতেন।

ইমদাদুল হক মিলন : তিনি আপনার মাকে কী বললেন ?

হুমায়ূন আহমেদ : পৃথিবীর সব বাবাই সন্তানদের সামান্য প্রতিভায়ই মুগ্ধ হন। তিনিও হয়েছিলেন। তাঁর মুগ্ধতা যে উঁচু পর্যায়ে ছিল, তার প্রমাণ পেলাম কিছুদিন পর। তিনি তখন একটা রেডিও নাটক লিখে শেষ করেছেন। নাম 'কত তারা আকাশে'। হঠাৎ সেই নাটকের পাণ্ডুলিপি আমার হাতে দিয়ে বললেন, তুই তোর মতো করে ঠিকঠাক করে দে।

আমি আমার এক জীবনে অনেক সাহিত্য পুরস্কার পেয়েছে—ওই দিনের সাহিত্য পুরস্কার সব পুরস্কারের ওপরে।

মিলন, আজ আর না। অনেক বকবক করেছি।

ইমদাদুল হক মিলন : ঠিক আছে, আজ এ পর্যন্তই।

৩

ইমদাদুল হক মিলন : আপনার আমেরিকা যাওয়া প্রসঙ্গে জানতে চাই। আপনার চারটি বই বের হলো, আপনি আমেরিকায় চলে গেলেন। আমেরিকায় ছয় বছর ছিলেন একটানা। নোভা, শীলা দুজনেরই কি জন্ম হয়েছে ওখানে ?

হুমায়ূন আহমেদ : নোভা দেশেই হয়েছে। শিলার জন্ম হয়েছে ওখানে।

ইমদাদুল হক মিলন : ছয় বছর আপনি কিছু লেখেননি ?

হুমায়ূন আহমেদ : না। ওখানে পড়াশোনার চাপ এত বেশি ছিল, লেখালেখির বিষয়টা মাথায়ই ছিল না। তা ছাড়া তখন বিদেশে আমাদের প্রথম সংসার, জানি না কিছু, নোভার মাও তো খুবই বাচ্চা মেয়ে, সেও তো কিছু জানে না। সংসার চালানো এবং পড়াশোনার বাইরে কিছু করার সুযোগ ছিল না। অবসর কাটত টিভি দেখে।

ইমদাদুল হক মিলন : আর এমনিতে সাহিত্যের পড়াশোনা ?

হুমায়ূন আহমেদ : সাহিত্যের পড়াশোনা মানে কি গল্প-উপন্যাস ? গল্প-উপন্যাস একটা বয়স পর্যন্ত পাগলের মতো পড়েছি। তারপর সেই পাঠকের মৃত্যু হয়েছে। অন্য সব বিষয় পড়ার আগ্রহ তৈরি হয়েছে। বিষয় কী তোমাকে বলব না। তুমি আমাকে বুদ্ধিজীবী ভেবে বসতে পারো।

আমার পছন্দের বইপত্র পড়ার সুযোগ আমেরিকায় ছিল। ইউনিভার্সিটির বিশাল লাইব্রেরি। লাইব্রেরি ভর্তি বই। তবে আমার সময় ছিল না। গাদা গাদা বই 'লাইব্রেরি থেকে নিয়ে আসতাম, এক সপ্তাহ পর না পড়েই ফেরত দিতাম। পড়াশোনাটা করতাম মাঝে মধ্যে, যখন সামারে ছুটি হতো। এত পয়সা কড়ি তো ছিল না যে পুরো সামার বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে ঘুরব। পছন্দের পড়াশোনা বা গল্পের বই যা পড়ার ওই সময়ই পড়তাম। ওই সময় পাঠ্যবই খুলে দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

ইমদাদুল হক মিলন : আপনি যে আমেরিকায় পড়লেন 'পলিমার কেমিস্ট্রি', ওই বিষয়ে কি আপনি লেখালেখি করেন নি ? বা থিসিসটা কি বের হয় নি বই হয়ে ?

হুমায়ূন আহমেদ : বিজ্ঞানের ওপর বিদেশে যে কাজগুলো হয় ওগুলোর থিসিস পাবলিশড হয় না, থিসিস থেকে পেপার পাবলিশড হয় বিদেশি জার্নালগুলোতে। আমার ২৫টির মতো পেপার ইন্টারন্যাশনাল জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। থিসিসের কাজ এবং পরে পোস্ট ডক করার সময়ের কাজ নিয়ে।

ইমদাদুল হক মিলন : আমেরিকা থেকে আপনি ফিরে এলেন '৮৪-র দিকে বোধ হয় ? তার আগে, মাত্র চারটি বই লিখে বাংলা একাডেমী পুরস্কার পেয়েছেন। এটা একটা অবিস্মরণীয় ঘটনা। আপনি ফিরে এসে আবার লেখালেখির সঙ্গে যুক্ত হওয়ার কথা ভাবলেন কী করে ? তখন তো আপনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেছেন, আপনার সংসারটা বড় হয়েছে।

হুমায়ূন আহমেদ : হয়তো লেখালেখির বিষয়টা ভেতরে ছিল সব সময়। যদি ভেতরে থাকে তাহলে লেখালেখি বিষয়টা মাথার গভীরে এক ধরনের চাপ দিতেই থাকে। এই চাপটা একটা কারণ হতে পারে। দেশে ফিরে এসেছি, বিশ্ববিদ্যালয়ে জয়েন করেছি। আবার আমি যে একজন লেখকও, ওটাও তো মাথায় ছিল।

ইমদাদুল হক মিলন : লেখালেখির ক্ষেত্রে বড় গ্যাপ পড়লে একটা অস্বস্তি তৈরি হয়। আপনার সে অস্বস্তিটা কি তৈরি হয়েছিল যে এত দিন পর আমি আবার শুরু করলাম!

হুমায়ূন আহমেদ : এটা আসলে মনে করতে পারছি না। মনে হয় না ছিল। কারণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে যাঁরা লেখালেখি করেন, তাঁরা এগুলো নিয়ে মাথা ঘামান না। অনেক দিন লিখি নি তাতে কী হয়েছে ? আবার লিখব। ইচ্ছা না করলে আবার বন্ধ করে দেব।

ইমদাদুল হক মিলন : কিন্তু এই স্বতঃস্ফূর্ততা কি আপনার প্রথম থেকে ছিল, নাকি আস্তে আস্তে...?

হুমায়ূন আহমেদ : না। আমার মনে হয় এটা শুরু থেকেই ছিল। মাঝেমধ্যে এটা একটু কেটে গেছে, এটা বলতে পারো। কিছু কিছু লেখার ক্ষেত্রে খুবই চিন্তাভাবনা করে লাইনগুলো লিখতে হয়েছে। একটা লাইন লিখে দ্বিতীয় লাইনটির জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছে। দ্বিতীয় লাইন আসি আসি করছে, আসছে না—এই অবস্থা।

ইমদাদুল হক মিলন : নাটকের দিকটায় আপনি যে গেলেন, সেই প্রসঙ্গটায় আমি একটু পরে আসছি। এই যে দেশের বাইরে থেকে ফিরেই একটার পর একটা বই আপনি লিখতে থাকলেন, নাটক তো আরও পরে '৮৫-র দিকে। '৮৫-তে আপনি 'এইসব দিনরাত্রি' শুরু করেছিলেন। আমার মনে আছে। কিন্তু এই যে একটার পর একটা লেখা, পাঠককে মন্ত্রমুগ্ধ করা, এই যে এই অবস্থাটা তৈরি হলো, আপনার কী মনে হয়, এর পেছনে রহস্যটা কী ?

হুমায়ূন আহমেদ : এই অবস্থা যে তৈরি হয়েছিল, এই বিষয়টার একটা নরমাল আর একটা আদিভৌতিক ব্যাখ্যা আছে।

ইমদাদুল হক মিলন : বলেন, দুটোই শুনি।

হুমায়ূন আহমেদ : নরমাল ব্যাখ্যা হলো, আমি নাটক লেখা শুরু করলাম। আমাদের দেশে নাটকের দর্শক তো অনেক বেশি। 'এইসব দিনরাত্রি' বহু লোক দেখা শুরু করল এবং এরা মনে করল এই যে লোকটি নাটক লিখছে, তার একটা বই পড়ে দেখি না কেন! তারা বই কিনতে শুরু করল। পাঠকদের আমার বইয়ের প্রতি আগ্রহী হওয়ার পেছনে 'এইসব দিনরাত্রি' নাটকটা কাজ করেছে বলে আমার নিজের ধারণা। একজন নতুন লেখক লিখবে আর সঙ্গে সঙ্গেই তার বই বিক্রি হবে—এটা তো হওয়ার কথা না। আমার ধারণা, আমার নাটক দেখে লোকজন আগ্রহী হয়েছে, একটা বই পড়ে হয়তো সেকেন্ড বই পড়তে চেয়েছে—এটা হতে পারে।

আর আদিভৌতিক ব্যাখ্যা যেটা হলো—শহীদুল্লাহ হলে যখন থাকি, তখন একসঙ্গে প্রকাশকদের কাছ থেকে আমি হঠাৎ কিছু বড় অঙ্কের টাকা পেয়ে গেলাম। ২৫-৩০ হাজার টাকা। সেই সময় ২৫-৩০ হাজার টাকা অনেক টাকা। বই বিক্রির টাকা। তখনো বই লেখা বাবদ অ্যাডভান্স দেওয়া শুরু হয় নি। যেহেতু টাকা পেয়েছি, আমার হাত খুব উশখুশ করছিল টাকাটা খরচ করার জন্য। কাজেই করলাম কী, স্ত্রী এবং বাচ্চাদের নিয়ে গেলাম ইন্ডিয়ায়। এই টাকা শেষ না হওয়া পর্যন্ত দেশভ্রমণ হবে—এই হলো পরিকল্পনা। প্রথমে গেলাম নেপালে, নেপাল থেকে দিল্লি। ভাবলাম, এত কাছে যখন এলাম, মরুভূমি দেখে যাই। জয়সলমীরের উদ্দেশে রওনা দিলাম। জয়সলমীরের পথে পড়ল আজমীর শরিফ। এত নাম শুনেছি—পথে যখন পড়লই, তখন ভাবলাম যে আজমীর শরিফ দেখে যাই। আজমীর শরিফ গেলাম। আমার সবচেয়ে ছোট মেয়েটি, বিপাশা, সে খুবই বিরক্ত হয়ে গেল; বলল, কোথায় নিয়ে এলে? চারদিকে ফকির। ফকিরে ভর্তি জায়গাটি। বিপাশার বয়স তখন তিন-সাড়ে তিন। আমি তাকে বোঝালাম যে এখানে একজন অতি বড় সাধু মানুষের কবর আছে। এখানে এলে আল্লাহর কাছে যা চাওয়া যায়, তা পাওয়া যায়। দেখা গেল যে এই কথা শুনে মানসিকভাবে সে স্বস্তি বোধ করল। তখন তাকে নিয়ে গেলাম কবর জিয়ারত করতে, জিয়ারত শেষ করে চলে আসব, দেখি বিপাশা দাঁড়িয়ে। ব্যাপার কী? বিপাশা বলল, 'আমি যেটা চেয়েছি, সেটা তো পাই নি। না পেলে যাব না।' আমি বললাম, মা, তুমি কী চেয়েছ? বিপাশা বলল, 'আল্লাহর কাছে আমি এক হাজার বস্তা টাকা চেয়েছি। এই টাকা না পাওয়া পর্যন্ত এখান থেকে আমি যাব না।' কবরস্থানের পাশে রেলিংটা ধরে সে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। আমি ও তার মা তাকে নিয়ে টানাটানি করতে লাগলাম। না, সে এ জায়গা ছেড়ে নড়বে না। এদিকে বাংলাভাষী কিছু লোক ছিল, তারা খুবই মজা পেয়ে গেল। একটি মেয়ে এক হাজার বস্তা টাকা আল্লাহর কাছে চাইছে, না পাওয়া পর্যন্ত সে যাবে না—এটা তো মজার বিষয়ই। তখন বিপাশাকে বোঝালাম যে এখন টাকাটা পেলে বরং সমস্যা হবে। এত টাকা দেশে নিয়ে যেতে হবে। কান্নাকাটি না করে চলো দেশে যাই। দেশে গেলে টাকাটা পেয়ে যাবে। অবশ্যই পাবে। আমরা দেশে ফিরে এলাম। আসার পরপরই জলের মতো হু

হু করে টাকা আসতে লাগল। কেউ যখন আমাকে জিজ্ঞেস করে, লেখালেখি করে বিপুল অর্থ উপার্জন আপনি কীভাবে করলেন ? আমি বলি, আমার ছোট মেয়ে বিপাশার কারণে করেছি—এখানে আমার কোনো হাত নেই।

ইমদাদুল হক মিলন : আপনি যে ঘটনা বললেন, এটি সত্যি মনে রাখার মতোই ঘটনা। আপনি কি অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাসী ?

হুমায়ূন আহমেদ : না। পৃথিবী লজিকে চলে। মিরাকল পৃথিবীর চালিকাশক্তি নয়।

ইমদাদুল হক মিলন : কিন্তু আপনি তো প্রায়ই মাজারে যান। সিলেটে গেলেই হযরত শাহজালাল সাহেবের মাজার জিয়ারত করেন।

হুমায়ূন আহমেদ : মহাপুরুষদের মাজার জিয়ারত করা মানেই কিন্তু অলৌকিকে বিশ্বাস স্থাপন না। শাহজালাল, শাহ মখদুম, শাহ পরান—এঁরা সবাই উঁচু শ্রেণীর সুফি মানুষ। সব কিছু ছেড়েছুড়ে মানুষের কল্যাণের জন্য এ দেশে এসেছেন। ধর্মীয় কাজকর্মের পরও তাঁরা পুরো জীবন ব্যয় করেছেন সাধারণ মানুষের কল্যাণের জন্য। তাঁরা তো মহাপুরুষ পর্যায়ের মানুষ। আমরা যদি অন্য কোনো বিখ্যাত ব্যক্তির কবরস্থানে যাই তাঁকে সম্মান দেখানোর জন্য—আমরা এঁদের কাছে যাব না কেন ? একটু চিন্তা করে দেখো, কোথায় কোন দেশ থেকে কত জায়গা ঘুরে তাঁরা বাংলাদেশে এসেছেন। তাঁদের ত্যাগটা দেখো না! তাঁদের কষ্টটা দেখো না। তা ছাড়া মুসলমান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছি, ইসলামি ভাবধারায় বড় হয়েছি, ছোটবেলা থেকে মা-বাবাকে দেখেছি—তাঁরা নামাজ পড়ছেন, সকালবেলা ঘুম ভেঙেছে আমার মায়ের কোরআন তিলাওয়াত শুনে। এটা তো ব্রেনের মধ্যে ঢুকে যায়।

৪

ইমদাদুল হক মিলন : আপনি অনেক দিন ধরে বলছেন যে হজরত মুহাম্মদ (সা.) এর জীবনী লিখতে চান। সেই লেখার প্রস্তুতি কী রকম ?

হুমায়ূন আহমেদ : আমার প্রস্তুতির কথা বলব, কিন্তু এখানেও কিছু সমস্যা আছে। সমস্যা হলো দুই ধরনের। প্রথম সমস্যা হলো, আমার মধ্যে কিছু ছেলেমানুষি আছে তো...আমি যখন সব কিছু ঠিকঠাক করলাম, তখন একটা ঘটনা ঘটে। শুরু থেকেই বলি। বাংলাবাজারে অন্যপ্রকাশের একটি স্টল আছে। স্টলটি উদ্বোধনের জন্য আমাকে নিয়ে যাওয়া হয়। অনেক দিন পরে আমি বাংলাবাজারে গেলাম। স্টলের ফিটাটিতা কাটলাম। এক মাওলানা সাহেব প্রার্থনা করলেন। আমি খুবই অবাক হয়ে তাঁর প্রার্থনা শুনলাম। আমার কাছে মনে হলো, এটি বইপত্র সম্পর্কিত খুবই ভালো ও ভাবুক ধরনের প্রার্থনা। একজন মাওলানা এত সুন্দর করে প্রার্থনা করতে পারেন যে আমি একটা ধাক্কার মতো খেলাম। মাওলানা সাহেবকে ডেকে বললাম, 'ভাই, আপনার প্রার্থনাটা শুনে আমার ভালো লেগেছে।' মাওলানা সাহেব বললেন, 'স্যার,

আমার জীবনের একটা বড় আকাঙ্ক্ষা ছিল আপনার সঙ্গে একদিন দেখা হবে। আল্লাহ আমাকে সেই সুযোগ করে দিয়েছেন। আপনার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে।' আমি তাঁর কথা শুনে বিস্মিত হলাম। আমি বললাম, 'এই আকাঙ্ক্ষাটি ছিল কেন ?' মাওলানা সাহেব বললেন, 'আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই কারণ আমি ঠিক করেছি, দেখা হলেই আপনাকে আমি একটা অনুরোধ করব।'

'কী অনুরোধ শুনি ?'

'আপনার লেখা স্যার এত লোকজন আগ্রহ নিয়ে পড়ে, আপনি যদি আমাদের নবী করিমের জীবনীটা লিখতেন, তাহলে বহু লোক এই লেখাটি আগ্রহ করে পাঠ করত। আপনি খুব সুন্দর করে তাঁর জীবনী লিখতে পারতেন।'

মাওলানা সাহেব কথাগুলো এত সুন্দর করে বললেন যে আমার মাথার ভেতর একটা ঘোর তৈরি হলো। আমি তাঁর কাঁধে হাত রেখে বললাম, 'ভাই, আপনার কথাটা আমার খুবই মনে লেগেছে। আমি নবী করিমের জীবনী লিখব।' এই হলো ফার্স্ট পার্ট। চট করে তো জীবনী লেখা যায় না। এটা একটা জটিল ব্যাপার, কাজটা বড় সেনসেটিভ। এতে কোথাও একটু উনিশ-বিশ হতে দেওয়া যাবে না। লিখতে গিয়ে কোথাও যদি আমি ভুল তথ্য দিয়ে দিই, এটি হবে খুবই বড় অপরাধ। এটা আমাকে লেখা শুরু করতে বাধা দিল।

ইমদাদুল হক মিলন : আপনি কি মহানবী (সা.) এর জীবনী লেখার কাজটা শুরু করেছিলেন ?

হুমায়ূন আহমেদ : নাহ্, আমি লেখার কাজ শুরু করি নি। আমি *অন্যদিন*-এর মাসুমকে বললাম, 'তুমি একটা সুন্দর কাভার তৈরি করে দাও তো। কাভারটা চোখের সামনে থাকুক। তাহলে আমার শুরু করার আগ্রহটা বাড়বে।' মাসুম খুব চমৎকার একটা কাভার তৈরি করে দিল। বইটার নামও দিলাম—'নবীজী'। তখন একটা ছেলেমানুষি ঢুকে গেল মাথার মধ্যে। ছেলেমানুষিটা হলো, আমি শুনেছি বহু লোক নাকি আমাদের নবীজীকে স্বপ্নে দেখেছেন। কিন্তু আমি তো কখনো তাঁকে স্বপ্নে দেখি নি। আমি ঠিক করলাম, যেদিন নবীজীকে স্বপ্নে দেখব, তার পরদিন থেকে লেখাটা শুরু করব। স্বপ্নে এখন পর্যন্ত তাঁকে দেখি নি। যেহেতু এক ধরনের ছেলেমানুষি প্রতিজ্ঞার ভেতর আছি, সে কারণে লেখাটা শুরু করতে পারি নি। ব্যাপারটা হাস্যকর। তবু আমি স্বপ্নের অপেক্ষায় আছি।

ইমদাদুল হক মিলন : আপনার প্রস্তুতি কী ? মানে পড়াশোনা আর অন্যান্য...।

হুমায়ূন আহমেদ : আমার প্রস্তুতি ভালো। পড়াশোনা ভালোই করেছি। বইপত্র জোগাড় করতে পেরেছি। বন্ধুরাও বইপত্র সংগ্রহ করতে সাহায্য করেছেন। কাজেই এখন আমি বলতে পারি যে নবীর জীবনী লেখার জন্য আমার প্রস্তুতি যথেষ্ট হয়েছে।

ইমদাদুল হক মিলন : বাংলা ভাষায় হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর যেসব জীবনী লেখা হয়েছে, এর মধ্যে আপনার পছন্দের কোনটা ?

হুমায়ূন আহমেদ : সত্যি কথা বলতে কি, আমার তেমন পছন্দের কোনো জীবনী নেই। জীবনীগুলোর মধ্যে ভক্তি চূড়ান্তভাবে বেশি। আমার লেখার মধ্যেও ভক্তি থাকবে। কিন্তু একটু অন্যভাবে থাকবে এবং আরও কিছু ব্যাপার থাকবে।

ইমদাদুল হক মিলন : ধানমণ্ডিতে আপনার বাড়িটা যখন করলেন, তখন আমি দেখেছি, আপনি একটা নামাজঘর করেছেন। নুহাশপল্লীতেও আপনি নামাজের জন্য আলাদা জায়গা রেখেছেন। এটা কোন চিন্তা থেকে করেছেন ?

হুমায়ূন আহমেদ : নামাজঘর করার চিন্তাটা ধর্মীয় ভাব থেকে যতটা না এসেছে, তার চেয়ে বেশি এসেছে পশ্চিমবঙ্গের লেখকদের বই পড়ে। তাঁদের বইয়ে দেখি, তাঁদের একটা ঠাকুরঘর আছে, পূজাঘর আছে। তাঁরা প্রতিটি বাড়িতে একটা অংশ আলাদা করে রাখেন উপাসনার জন্য। এই কাজটা আমরা করি না। আমাদের প্রার্থনার জন্য আলাদা জায়গা রাখি না। নামাজঘর বানাই না। আমি বানাতে চেয়েছি। আর নুহাশপল্লীতে আমি নামাজের জায়গাটা করেছি আমার মায়ের জন্য। একটা খোলা মাঠে—লোকজন নেই, একটা গাছের নিচে বসে নামাজ পড়তে হয়তো বা তাঁর ভালো লাগবে—এ কথা মনে করেই শ্বেতপাথর বসিয়ে একটা জায়গা আলাদা করে দিয়েছি।

ইমদাদুল হক মিলন : এবার অন্য প্রসঙ্গে আসি। হুমায়ূন ভাই, আপনি বহু বিষয়ে আগ্রহী। এর মধ্যে আপনার একটি খুব প্রিয় বিষয় হচ্ছে ভূত; এবং বহু স্মরণীয় ভূতের গল্প লিখেছেন আপনি। আপনার ছোট ছোট অনেক অভিজ্ঞতার কথা জানি আমরা। এই ভূত ব্যাপারটা নিয়ে আপনার বিশ্বাসটা কী ?

হুমায়ূন আহমেদ : বিশ্বাসটা হলো, আমি মনে করি না ভূত বলে কিছু আছে। ভূত না থাকলেও ভূতের ভয় আছে। ভূতের ভয় আছে বলেই ভূতের গল্প আছে।

ইমদাদুল হক মিলন : তাহলে কি বলব, আপনি বানিয়ে বানিয়ে লেখেন ?

হুমায়ূন আহমেদ : গল্প-উপন্যাস মানেই কি বানানো বিষয় নয় ? গল্প-উপন্যাস তো ইতিহাস নয়। তার পরও কিছু কিছু ব্যাপার ঘটেও যায়।

ইমদাদুল হক মিলন : কিন্তু ভূত আপনি বিশ্বাস করেন না। লেখেন, আবার বলছেন এমন ঘটনা ঘটে—বিষয়টা কী রকম ?

হুমায়ূন আহমেদ : একটা উদাহরণ দিই। আমি তখন শহীদুল্লাহ হলের হাউস টিউটর। সেখানে একদিন রাতে আমার স্ত্রীর ঘুম ভাঙল। মাঝখানে বিপাশা, এক পাশে আমি আরেক পাশে সে। ঘুম ভাঙার পর সে খাট থেকে নামল। নামার সময় স্বামীর ওপর দিয়ে পার হওয়া যায় না—মেয়েদের একটা বিষয় থাকে না। তাই তাকে অনেক কষ্ট করে নিচে নামতে হলো, যাতে আমার গায়ের সঙ্গে পা লেগে না যায়। খাট থেকে নেমে সে দরজাটা খুলে বারান্দায় এল। বারান্দায় এসে দেখে আমি টেবিলে বসে লেখালেখি করছি। এটা দেখে সে চিৎকার দিয়ে উঠল। এই ঘটনাটা মাথায় রেখে আমি একটা ভূতের গল্প লিখেছি, নাম হচ্ছে 'দ্বিতীয়জন'।

ইমদাদুল হক মিলন : কিন্তু আসলে আপনি লিখছিলেন, না ঘুমাচ্ছিলেন ?

হুমায়ূন আহমেদ : আমি লিখছিলাম।

ইমদাদুল হক মিলন : তার মানে ভাবির এ ব্যাপারটা ঘটেছে ঘুমের ঘোরে ?

হুমায়ূন আহমেদ : হ্যাঁ, ঘুমের ঘোরে কিংবা হয়তো তার মাথার মধ্যে আছে যে এখানে একটা লোক ঘুমায়। এ বিষয়টার লৌকিক ব্যাখ্যা কিন্তু এটাই। তার মনের মধ্যে আছে আমি তার পাশে ঘুমাচ্ছি।

ইমদাদুল হক মিলন : কিন্তু আপনার নুহাশপল্লীতে কিছু ভৌতিক ঘটনার কথা শুনেছি। সেগুলোর ব্যাখ্যা কী ? ঘটনাগুলোই বা কী ?

হুমায়ূন আহমেদ : ঘটনাগুলো ভয়াবহ। কাজেই এ ঘটনাগুলো বলে লোকজনকে নতুন করে ভূতপ্রেতে বিশ্বাস করাতে আমি রাজি নই। প্রতিটি ঘটনার লৌকিক ব্যাখ্যা অবশ্যই আছে। আমরা বের করতে পারছি না। ব্যর্থতা আমাদের।

ইমদাদুল হক মিলন : না, আমরা আপনার অভিজ্ঞতার কথাটা জানতে চাই।

হুমায়ূন আহমেদ : ভালো ঝামেলায় পড়লাম! আচ্ছা ঠিক আছে, একটা অভিজ্ঞতার কথা বলি, স্বপ্নবিষয়ক অভিজ্ঞতা। আমি প্রায়ই স্বপ্নে দেখতাম, আমি আর আমার মা একটা অদ্ভুত ঘরে বাস করছি। কেউ কারও সঙ্গে কথা বলতে পারছি না এবং ঘরের ভেতর ইয়েলো লাইট। দুজন থাকি খুব কাছাকাছি, কিন্তু কেউ কারও সঙ্গে কথা বলি না। আমি মাকে স্বপ্নের কথাটা বললাম। তিনি তো বুঝলেন না কেন স্বপ্নটা দেখি। তারপর একসময় ভাবলাম, হয়তো মৃত্যুর পর এক জায়গায় দেখা হবে দুজনের, সেটাই হয়তো দেখি। স্বপ্ন দেখার অনেক পরে আমাদের বাইপাস অপারেশনটা হলো—মা ও ছেলের একই সঙ্গে, সিঙ্গাপুরে আমাদের দুজনকে একই কেবিনে রাখা হলো। যদিও পুরুষ আর নারীদের আলাদা থাকার কথা। যেহেতু মাদার অ্যান্ড সন, তাই একত্রে রাখা হলো। অপারেশনের পর আমার যখন প্রথম জ্ঞান হলো, আমি তাকালাম এবং সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলাম যে এই ঘরটাই আমি দিনের পর দিন স্বপ্নে দেখেছি। এখানেও ছোট্ট ঘর, ইয়েলো লাইট, পাশাপাশি দুজন, কেউ কারও সঙ্গে কথা বলতে পারছি না। এর ব্যাখ্যাটা কী বলো ?

ইমদাদুল হক মিলন : আমি আপনার ব্যাখ্যাটাই আসলে জানতে চাই। স্বপ্ন নিয়ে আপনার ব্যাখ্যাটা কী ?

হুমায়ূন আহমেদ : আমার কোনো ব্যাখ্যা নেই। ব্যাখ্যা করার যোগ্যতাও নেই। সিগমন্ড ফ্রয়েড যৌনতা স্বপ্নের মূল—এই ব্যাখ্যা করেছেন। সেই ব্যাখ্যা খুব গ্রাহ্য হয়েছে বলে মনে হয় নি। তাঁরই ছাত্র অধ্যাপক জাংক গুরুর সঙ্গে একমত ছিলেন না। তিনি অনেক গবেষণা করেছেন প্রিক্যানিশন ড্রিম নিয়ে। প্রিক্যানিশন ড্রিম হলো স্বপ্নে ভবিষ্যৎ দেখে ফেলা।

এ রকম গল্প তো প্রায়ই শোনা যায়—নিকটআত্মীয় মারা গেছে, মৃত্যুর সময় সে স্বপ্নে দেখা দিয়ে প্রিয়জনদের বলেছে—আমি চলে যাচ্ছি—তোমার কাছ থেকে বিদায় নিতে এসেছি। এসব ঘটনার কি ব্যাখ্যা আছে ?

ইমদাদুল হক মিলন : ধর্মীয় ব্যাখ্যা কি আছে ?

হুমায়ূন আহমেদ : থাকতে পারে, আমি বলতে পারছি না। বড় আলেমরা বলতে পারবেন। আত্মার মৃত্যু নেই—এটি সব ধর্মই বলছে। আত্মাটা কী তা কিন্তু তেমনভাবে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে না। পবিত্র কোরআনে আল্লাহপাক আত্মাকে বলেছেন 'Order of God' আত্মা হলো আল্লাহর আদেশ। এর মানে আমার কাছে পরিষ্কার নয়।

৫

ইমদাদুল হক মিলন : লেখায় আপনি সব সময় এক ধরনের রহস্য তৈরি করেন। এসব রহস্য নিয়ে আপনার ব্যাখ্যা কী ?

হুমায়ূন আহমেদ : আসলে মিলন, আমার কাছে পুরো জীবনটাই অত্যন্ত রহস্যময়। এই রহস্যের কোনোরকম কূল-কিনারা আমি পাই না। জীবনের যে রহস্যময়তা আছে, সেই রহস্যময়তা কিছুটা হলেও আমি আমার লেখায় আনতে চাই। জীবনের রহস্যময়তা তো আমি প্রায়ই বোধ করি।

একদিন সকালে আমার ঘুম ভাঙল নুহাশপল্লীতে। বের হয়ে এলাম। সাধারণত আমার এত সকালে ঘুম ভাঙে না। কী কারণে যেন সেদিন ঘুম ভেঙেছে। দেখি দুনিয়ার পাখি ডাকছে। আকাশ সামান্য লাল এবং গজারিগাছগুলোর ভেতর নতুন পাতা। গাছে যখন নতুন পাতা আসে, তখন সেটা থাকে একদম সফট গ্রিন। ওই সফট গ্রিনের ওপর সূর্যের আলোটা পড়েছে। গ্রিন এবং সূর্যের আলো মিলে মনে হচ্ছে, পাতাগুলো সোনালি হয়ে গেছে। দেখে মনে হলো, আমি আমার জীবনের অসম্ভব সুন্দর একটা দৃশ্য দেখলাম। তখন হঠাৎ মনে হলো, এই দৃশ্যটি কিন্তু একজন কেউ আমাকে দেখাতে চাইছেন। দেখিয়ে আমাকে আনন্দ দিতে চাইছেন। সেই একজনটা হচ্ছেন গড অলমাইটি। আর দেখে যে আমি মুগ্ধ হলাম, এটাই আমার মনে হলো আমার প্রার্থনা। আলাদা করে বসে প্রেয়ারের চেয়ে তাঁর সৃষ্টি দেখে মুগ্ধ হওয়া—এই প্রেয়ারটি আমার কাছে সব সময় মনে হয় অনেক অনেক ইম্পরট্যান্ট।

ইমদাদুল হক মিলন : পাখি ডাকার রহস্যটা কী ছিল ?

হুমায়ূন আহমেদ : ভোরে কত পাখি যে একসঙ্গে ডাকে! এটা তো কখনো আমরা শোনার চেষ্টা করি না। আমাদের তো ঘুম ভাঙে কাকের ডাকে। ওখানে কাক নেই। আমার জীবনে আরও অনেক রহস্যময় ব্যাপার আছে। যেমন ধরো, নুহাশপল্লীতে একটা পুকুর আছে। একদিন দেখলাম, দুটি অতিথি পাখি পুকুরে নেমেছে—ওদের তো নামার কথা বিলে, এখানে তো নামার কথা না। আমি মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে আছি এবং সবাইকে বললাম, খবরদার! কেউ যেন ডিস্টার্ব না করে ওদের। ওরা নেমে গেছে ওখানে। অতিথি পাখি দুটি হচ্ছে বালিহাঁস। তো, এটা একটা খুব বড় ঘটনা না ? আমি ঝিম ধরে বসে আছি পাখি দুটির কাণ্ডকারখানা দেখার জন্য। পরের বছর আমি আশা করেছিলাম, ওরা গিয়ে অন্যদের খবর দেবে যে এখানে ভালো জায়গা আছে। আরও পাখি আসবে।

ইমদাদুল হক মিলন : আমার মনে হয়, বাংলাদেশে সায়েন্স ফিকশনের জনক যদি কাউকে বলতে হয় তো সে আপনি। সায়েন্স ফিকশনকে বাংলা সাহিত্যে আপনি জনপ্রিয় করেছেন। *তোমাদের জন্য ভালোবাসা* একটি চমৎকার বই। এটাই আপনার লেখা প্রথম সায়েন্স ফিকশন। এখন আমার কথা হলো, আপনি একাধারে সায়েন্স ফিকশন লিখছেন, আবার ভূতের গল্প-রহস্য গল্প লিখছেন। দুটোকে আপনি মেলাচ্ছেন কী করে ? এটাও আমার কাছে রহস্যময় মনে হয়।

হুমায়ূন আহমেদ : তুমি যে রহস্য নিয়ে ঘটঘট করে যাচ্ছ, এটাও তো আমার কাছে রহস্যময় মনে হচ্ছে। আজকের মতো রহস্যের যবনিকাপাত হোক। এসো শেষ করি। রবীন্দ্রনাথের কবিতা দিয়ে আজকের মতো শেষ করি—

চিরকাল এইসব
রহস্য আছে নীরব।
রুদ্ধ ওষ্ঠাধর।
জন্মান্তের নবপ্রাতে
সে হয়তো আপনাতে
পেয়েছে উত্তর—

৬

ইমদাদুল হক মিলন : রবীন্দ্রনাথের কবিতার লাইন দিয়ে আপনি প্রচুর উপন্যাসের নাম দিয়েছেন। *শ্যামল ছায়া, সে আসে ধীরে, তুমি আমায় ডেকেছিলে ছুটির নিমন্ত্রণে, সেদিন চৈত্রমাস*—অনেক অনেক লেখা। রবীন্দ্রনাথের কবিতার লাইন দিয়ে উপন্যাসের নাম রেখেছেন কেন ?

হুমায়ূন আহমেদ : রবীন্দ্রনাথের কবিতার লাইন দিয়ে উপন্যাসের নাম রাখায় অসুবিধা কোথায় ? 'প্রেম করেছি বেশ করেছি'র মতো নামের চেয়ে রবীন্দ্রনাথের নাম সুন্দর না ?

ইমদাদুল হক মিলন : এতে বোঝা যায় যে, বাংলা কবিতার আপনি একজন অসাধারণ পাঠক। বোঝা যায় যে, আপনি রবীন্দ্রনাথ-জীবনানন্দ দাশ প্রচুর পড়েছেন। কবিতাপাঠের ব্যাপারটি আপনার মধ্যে কীভাবে তৈরি হয়েছিল ?

হুমায়ূন আহমেদ : আমার বাবা কবিতা মুখস্থ করতে পারলে পয়সা দিতেন। প্রধানত রবীন্দ্রনাথের কবিতা। ছোট কবিতার জন্য এক আনা, দীর্ঘ কবিতার জন্য দুই আনা। বাবার কাছ থেকে এই পয়সা পাওয়ার জন্যই আমরা ওই সময় কবিতা মুখস্থ করতাম। অর্থাৎ কবিতার প্রতি মমত্ববোধের পেছনে অর্থনীতি কাজ করেছে, ভালোবাসা নয়।

ইমদাদুল হক মিলন : আপনি যা বললেন, সে তো ছেলেবেলার কথা। কিন্তু এখনো নানা আড্ডায় আপনাকে দেখি রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ, বিষ্ণু

দে, অমিয় চক্রবর্তীর কবিতা অনর্গল বলে যাচ্ছেন। আপনার বহু উপন্যাসের পাতায়ও ইংরেজ ও ফরাসি কবিদের উদ্ধৃতি দেখতে পাই। এতে বোঝা যায় যে, আপনি কবিতার সঙ্গে দারুণভাবে সম্পৃক্ত। এটা তো আর সেই ছোটবেলায় পয়সার প্রতি লোভের কারণে নয়।

হুমায়ূন আহমেদ : একটা জিনিস যখন শুরু হয়, তখন তা চলতেই থাকে। আমার স্মৃতিশক্তি আগে ভালো ছিল। একটি কবিতা একবার, দুবার, তিনবার পড়লে মুখস্থ হয়ে যেত। কবিতা যদি মুখস্থ থাকে, আর আড্ডার মধ্যে যদি একটা দীর্ঘ কবিতা আবৃত্তি করা যায়—সবাই চমকায়। চমকটা আমার ভালো লাগে। আড্ডায় কবিতা পাঠের মানেই হয় না। কবিতা তো নিজের ব্যাপার। আমি তো আবৃত্তিকার নই।

ইমদাদুল হক মিলন : কিন্তু আপনি লেখালেখির শুরুর দিকে কবিতা লিখেছেন, আপনার বোনের নামে সেগুলো ছাপা হয়েছে এবং হুমায়ূন আহমেদ নামেও একটি কবিতার কার্ড ছাপা হয়েছে।

হুমায়ূন আহমেদ : আমি একটি উপন্যাস লিখেছি। নাম *কবি*। তারাশঙ্করও এই নামে উপন্যাস লিখেছেন—বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলোর মধ্যে এটি একটি। সেইখানে আমার মতো একজন লেখকের আরেকজন কবিকে নিয়ে উপন্যাস লেখার ব্যাপারটি কি দুঃসাহসিক নয়? তারাশঙ্করের কবি ছিলেন সেই সময়ের কবি, আর আমার কবি হচ্ছে আজকের কবি। তাদের জীবনবোধ, জীবনকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। তারাশঙ্করের কবি ছিল অতিদরিদ্র, আমার কবিও অতিদরিদ্র। দুজনের মধ্যেই কাব্যপ্রতিভা আছে। এই জিনিসটা নিয়েই লেখালেখির চেষ্টা করেছিলাম আর কি। তো, এই উপন্যাসের জন্যই কবিতার দরকার পড়ল। কাকে বলব? ভাবলাম আমিই লিখি। একইভাবে আমার একটি টিভি সিরিয়ালে গ্রাম্য গায়কের কিছু গানের দরকার ছিল। নাটকের গান তো, সিকোয়েন্স অনুযায়ী লিখতে হয়। কাকে দিয়ে গান লেখাব? নিজেই লিখলাম। দায়ে পড়ে আর কি! আমি হলাম দায়ে পড়ে কবি, দায়ে পড়ে গীতিকার।

ইমদাদুল হক মিলন : এটা ঠিক নয়। যে-কোনো লেখকের জন্যই কবিতা বা গান লেখা বেশ দুরূহ কাজ। কিন্তু আপনার যে কবিতার কার্ড বের হয়েছে কিংবা *কবি* উপন্যাসে যে টুকরো টুকরো কবিতার লাইন ব্যবহার করেছেন বা আপনার প্রথম উপন্যাস *শঙ্খনীল কারাগার*-এ যে কবিতার লাইনগুলো রয়েছে–'দিতে পারো একশ' ফানুস এনে/আজন্ম সলজ্জ সাধ একদিন আকাশে ফানুস ওড়াই।' এটা একজন কবির লেখা কবিতা—তা আপনি যতই ঠাট্টা-তামাশা করুন না কেন! এবং পরবর্তী সময়ে আপনি কিছু অসাধারণ গান লিখেছেন। তার মানে গান, কবিতা—এসব মিলে আপনার মধ্যে কাব্যপ্রতিভা আছেই। কবিতার ছন্দ, শব্দের ব্যবহার—এসব নিয়েও আপনি অনেক ভেবেছেন। এ ব্যাপারে আপনার ব্যাখ্যাটা কী?

হুমায়ূন আহমেদ : না, আমি কোনো ব্যাখ্যায় যেতে চাইছি না। আমি নিজেকে একজন গল্পকার মনে করি এবং গল্পকার পরিচয়েই আমি অনেক বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ

করি। কবিতাকে বলা হয় সাহিত্যের ফাইনেস্ট ফর্ম। এই ফাইনেস্ট ফর্মে কাজ করার ক্ষমতা আমার নেই। গদ্যটা হয়তো খানিকটা লিখতে পারি। কবিতা নিয়ে মাঝে মাঝে একটু চেষ্টা চলতে পারে, তাই বলে নিজেকে কখনোই আমি কবি বলি না। সেই প্রতিভাও আমার নেই।

ইমদাদুল হক মিলন : এ দেশের কবিদের সম্পর্কে আপনার অভিমত কী ?

হুমায়ূন আহমেদ : বাংলাদেশের সাহিত্যে যাঁরা কবিতা লিখছেন, আগে যাঁরা লিখেছেন, এখন যাঁরা লিখছেন—তাঁদের কাব্যপ্রতিভা সম্পর্কে আমার কোনো সংশয় নেই। বাংলাদেশ কবির দেশ।

ইমদাদুল হক মিলন : দু-চারজন পছন্দের কবির কথা কি বলবেন ?

হুমায়ূন আহমেদ : আমার প্রিয় কবিদের মধ্যে অনেকেই আছেন—শামসুর রাহমান, নির্মলেন্দু গুণ। এ ছাড়া রয়েছেন আল মাহমুদ—এখন তাঁর ব্যক্তিগত বিশ্বাস কবিতাকে কতখানি ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, সে প্রসঙ্গে আমি যাচ্ছি না।

ইমদাদুল হক মিলন : ব্যক্তিগত বিশ্বাস মানে ?

হুমায়ুন আহমদ : মানে তাঁর ধর্মবিশ্বাস। অনেকেই বলেন, ধর্মবিশ্বাস তাঁর কাব্যপ্রতিভাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। যেমন—শীর্ষেন্দু সম্পর্কে বলা হয় যে ধর্মবিশ্বাস তাঁর সাহিত্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।

ইমদাদুল হক মিলন : শীর্ষেন্দু অনুকূল ঠাকুরের শিষ্য। আপনি কি মনে করেন, শিষ্যত্ব গ্রহণ করার পর তাঁর সাহিত্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ?

হুমায়ূন আহমেদ : অনেকে সেটা বলেন। আমি বলি না। ব্যক্তিগত বিশ্বাস সাহিত্যকে কেন ক্ষতি করবে ? তাঁদের বিশ্বাসে বিশ্বাস স্থাপন না করলেই হয়। সাহিত্যের সবটাই আমরা নিই না। আমাদের যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু নিই।

ইমদাদুল হক মিলন : সৈয়দ শামসুল হকের কবিতা সম্পর্কে আপনার কী ধারণা ?

হুমায়ূন আহমেদ : কবিতার চেয়ে তাঁর গদ্য আমার বেশি পছন্দ, তার পরও তিনি যে কবি মানুষ, সেটা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই।

ইমদাদুল হক মিলন : স্বাধীনতা-উত্তর সময়ে কবিতার পরই মঞ্চনাটককে ধরা হয়। মঞ্চনাটক একটি বিরাট জায়গায় পৌঁছে গেছে এবং আপনি নিজেও কয়েকটি মঞ্চনাটক লিখেছেন। বাংলাদেশের মঞ্চনাটক সম্পর্কে আপনার বিবেচনাটা কী!

হুমায়ূন আহমেদ : মিলন, শোনো ভাই, আমি মোটামুটি ঘরের কোণে থাকা মানুষ, মঞ্চনাটক দেখতে হলে তো ঘরের বাইরে যেতে হয়—সেই আগ্রহটা কখনোই কোনো দিন বোধ করিনি। আমি অনেক বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছি একা একা টিভির সামনে বসে নাটক দেখতে। সিনেমা হলে ছবি দেখতেও আমার খারাপ লাগে না। ভালো লাগে। কিন্তু মঞ্চনাটক দেখতে কখনোই কেন যেন কোনো আগ্রহ বোধ করি নি। আরেকটি কথা আমার মনে হয়েছে, একজন লেখক চাইবেন তাঁর রচনা কত দ্রুত মানুষের কাছে পৌঁছায়। মঞ্চের মাধ্যমে কিন্তু ওই কাজটি আমরা করতে পারি না।

ইমদাদুল হক মিলন : হ্যাঁ, মঞ্চনাটকের দর্শক সীমিত।

হুমায়ূন আহমেদ : একটা হিসাবে দেখা গেছে, টিভিতে যখন নাটক প্রচারিত হয়, তখন সাড়ে তিন কোটি মানুষ দেখে। এই সাড়ে তিন কোটি মানুষকে মঞ্চনাটক দেখাতে হলে কত সময় লাগবে ? তুমিই হিসাব করে বলো। মঞ্চনাটক যে হলে মঞ্চস্থ হয়, সেই হলে পাঁচ শ সিট থাকে। অর্থাৎ প্রতিদিন পাঁচ শ মানুষ মঞ্চনাটক দেখে। সাড়ে তিন কোটি মানুষকে মঞ্চনাটক দেখাতে হলে কত বছর লাগবে ?

ইমদাদুল হক মিলন : হ্যাঁ, প্রচুর সময়, বেশ কয়েকটি বছর লাগে। কিন্তু এই মাধ্যমটিতে তো আপনি কাজ করেছেন।

হুমায়ূন আহমেদ : আমাকে জোর করে কাজ করানো হয়েছে।

ইমদাদুল হক মিলন : আপনার নাটকগুলো কিন্তু মঞ্চে সফল ?

হুমায়ূন আহমেদ : সফল না বিফল আমি জানি না। মঞ্চনাটক লেখার পুরো ব্যাপারটি আমার চাপে পড়ে করা; নিজের ইচ্ছা বা আগ্রহ থেকে নয়।

ইমদাদুল হক মিলন : কাদের চাপে করেছিলেন ?

হুমায়ূন আহমেদ : এই মুহূর্তে মনে নেই। প্রথম নাটকটি লিখি...

ইমদাদুল হক মিলন : তবিবুল ইসলাম বাবু, থিয়েটারের লোক। থিয়েটার যে কয়েক ভাগ হলো, তার একটির কর্ণধার। তাঁদের জন্য *নৃপতি* নামে একটি নাটক আপনি লিখেছিলেন।

হুমায়ূন আহমেদ : হ্যাঁ, তাদের জন্য লিখেছিলাম। তারপর এই তো এই রকমই আর কি!

ইমদাদুল হক মিলন : আপনার মঞ্চনাটকের ঘটনা আমি জানি। সেটা হচ্ছে, ড. আনিসুজ্জামান আপনার *নৃপতি* দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। পুরো নাটক দেখে তিনি বলেছিলেন, এটি একটি অসাধারণ নাটক। সুতরাং বলতে পারি, মঞ্চনাটকেও আপনি সফল নাট্যকার। কিন্তু আপনি এই মাধ্যমে আর কাজ করলেন না।

হুমায়ূন আহমেদ : কিন্তু জিনিস তো একটাই। যিনি টিভি নাটক লিখতে পারবেন, তিনি মঞ্চনাটকও লিখতে পারবেন।

ইমদাদুল হক মিলন : আপনি মনে করছেন না, কিন্তু আমরা মনে করছি যে এটা একটা বড় ব্যাপার।

হুমায়ূন আহমেদ : বড় ব্যাপার হলে বড় ব্যাপার। মঞ্চ প্রসঙ্গ অফ দাও তো।

ইমদাদুল হক মিলন : আচ্ছা দিলাম অফ। আপনি নিজের ভালো লাগাকে সব সময় বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। যা হোক, কয়েকটি ছোট প্রসঙ্গ আছে, যেগুলো আপনার ক্যারিয়ারের সঙ্গে জড়িত; যেমন—আপনি কয়েকটি বিজ্ঞাপন তৈরি করেছিলেন। একটি বিজ্ঞাপন আপনি কুদ্দুস বয়াতিকে নিয়ে তৈরি করেছিলেন। দুর্দান্ত জনপ্রিয় বিজ্ঞাপন। তারপর আপনি আরও কিছু বিজ্ঞাপন তৈরি করলেন। এ বিষয়ে কিছু কথা বলতে চাই।

হুমায়ূন আহমেদ : এগুলো হলো ফরমায়েশ। এই ফরমায়েশ বোধ হয় সবাইকেই পালন করতে হয়। এডুকেশন নিয়ে কিছু বিজ্ঞাপন আমি তৈরি করেছি; যেমন—ডায়রিয়া, চক্ষুদান, ওই যে ঘোঁটা ঘোঁটা...।

ইমদাদুল হক মিলন : সেটি দুর্দান্ত জনপ্রিয় হয়েছিল। সুজা খন্দকার, অভিনেতা। ভদ্রলোক তার পরই বোধ হয় মারা গেলেন।

হুমায়ূন আহমেদ : ওইগুলো বিনা পয়সায় করতাম। আমি ভাবতাম যে দেশের জন্য কাজ করছি। তারপর মনে হলো, কেন করছি ? এগুলো তো কোনো কাজে আসছে না। এরপর পয়সা নিয়ে কাজগুলো করেছি। যে কয়টা পেয়েছি করেছি এবং টাকাগুলো আমার কাজে লেগেছে। ছবি বানিয়ে বহু টাকা লোকসান দিয়েছি। বিজ্ঞাপন থেকে টাকা না পেলে সেই লোকসানটা আমি দিতে পারতাম না। কারণ যে কয়টা ছবি বানিয়েছি, লাখ লাখ টাকা পানিতে গেছে। এই লাখ লাখ টাকা তোলার জন্য বিজ্ঞাপন বানানো, নাটক লেখা, ডায়রিয়ার নাটক লেখা—এসব কাজ আমি করেছি।

ইমদাদুল হক মিলন : আপনার সিনেমা নিয়ে পরে কথা বলব। কিন্তু এই যে বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে এলেন, কিছু গান লিখলেন, কবিতা লিখলেন, আর আপনার প্রধান যে ক্ষেত্র গল্প-উপন্যাস, সে বিষয়ে আমরা আগেই কথা বলেছি। আপনি যেসব গান লিখলেন, সেগুলো দুর্দান্ত লেখা। আপনি বিজ্ঞাপনচিত্র বানালেন, সেগুলো জনপ্রিয় হলো। আমি বলতে চাইছি, আপনি যে ক্ষেত্রেই কাজ করেছেন, সে ক্ষেত্রেই ব্যাপকভাবে সফল। রহস্য কী!

হুমায়ূন আহমেদ : বলতে পারো আমি ভাগ্যবান।

ইমদাদুল হক মিলন : আমাদের দেশে স্বাধীনতার পরে আধুনিক নানা রকম বিজ্ঞাপন তৈরির হিড়িক পড়ে যায়। বিজ্ঞাপন শিল্প নিয়ে আপনার ভাবনাটি কী ?

হুমায়ূন আহমেদ : সারা পৃথিবীতে বিজ্ঞাপন শিল্পে নতুন নতুন জিনিস আসছে, নানা রকম কনসেপ্ট; যেমন—অ্যানিমেশন। অ্যানিমেশনে আমরা পিছিয়ে পড়লাম। এখন তো বাইরের বেশির ভাগ বিজ্ঞাপনে কম্পিউটার গ্রাফিকসের সাহায্য নেওয়া হয়। এখানে সেই সুযোগ তেমনভাবে নেই। তার পরও বিজ্ঞাপনের মান খারাপ বলা যাবে না। মাঝেমধ্যে যখন পাকিস্তান-বাংলাদেশের ক্রিকেট খেলা হয়, তখন পাকিস্তানের বিজ্ঞাপন দেখো—বিজ্ঞাপনের মান যে কত নিচে! পাশাপাশি আমরা আবার মুম্বাইয়ের বিজ্ঞাপনগুলো দেখছি। মান উঁচু। আবার আমাদের দেশের কিছু কিছু বিজ্ঞাপনের মান তো খুবই ভালো। গ্রামীণফোনের কিছু বিজ্ঞাপন দেখে মুগ্ধ হয়েছি। কিছু কিছু বিজ্ঞাপনের মান তত ভালো নয়। কম ভালো। এ দেশের বিজ্ঞাপনের ধারাটি খারাপ নয়।

ইমদাদুল হক মিলন : তার মানে আপনি বলতে চাইছেন, পৃথিবীর অন্যান্য দেশে মানুষ যে বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে এগোচ্ছে, আমাদের দেশের বিজ্ঞাপন নির্মাতারা তেমনিভাবে এগোচ্ছে, সেই পর্যায়ে যাচ্ছে!

হুমায়ূন আহমেদ : যাচ্ছে, যাচ্ছে তো বটেই। আমরা যদি আরও কিছু সুযোগ-সুবিধা পেতাম, তাহলে আরও এগোনো যেত। বিদেশে ওরা যে অর্থ ব্যয় করে, সেই অর্থ যদি আমরা ব্যয় করতে পারতাম! ওরা একটা বিজ্ঞাপনের পেছনে যে অর্থ ব্যয় করে, সেই অর্থে আমরা দুটি ছবি বানাতে পারি। তাই আমাদের দেশের বিজ্ঞাপন নির্মাতারা অল্প বাজেটে যে কাজটি করছেন, তাকে ছোট চোখে দেখার কিছু নেই।

ইমদাদুল হক মিলন : আরেকটি বিষয়ে জানতে চাই। আপনি দু-একটি উপন্যাস অনুবাদ করেছিলেন। থ্রিলার বা এ ধরনের কিছু; যেমন—আমার মনে আছে, *সম্রাট* নাম দিয়ে ওয়ারসির বইটি এবং *ম্যান অন ফায়ার*—এ বইটির ভাবানুবাদ করেছিলেন *অমানুষ* নামে। আপনি একজন মৌলিক লেখক হয়েও এই কাজগুলো কেন করতে গিয়েছিলেন ?

হুমায়ূন আহমেদ : সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক কারণে। কাজী আনোয়ার হোসেনের একটি প্রতিষ্ঠান আছে—সেবা প্রকাশনী। তাঁরা বাইরের লেখকের অনুবাদ বই ছাপতেন এবং এ জন্য কিছু পয়সা দিতেন। আমার তখন ভয়াবহ অর্থনৈতিক টানাটানি। সংসার চলে না এমন অবস্থা। কাজেই আমি এই দুটো বই অনুবাদ করলাম। *এক্সরসিস্ট* ও অনুবাদ করেছিলাম। অনুবাদ বলা ঠিক হবে না। আমি শুধু কাঠামোটি নিয়েছিলাম, বাকিটা আমার। জাস্ট কাঠামোটা নিয়ে আমি আমার মতো করে লিখেছি। লেখাগুলো সেখানে বাড়ানো হয়েছে। এই লেখাগুলো লিখেছি শুধু অর্থের জন্য; অন্য কোনো উদ্দেশ্য ওখানে কাজ করে নি।

ইমদাদুল হক মিলন : কাজী আনোয়ার হোসেনকে এসব লেখার স্বত্ব কি দিয়ে দিয়েছিলেন ?

হুমায়ূন আহমেদ : কী করেছিলাম—স্বত্ব দিয়েছিলাম কি না, এত দিন পরে আমার মনে নেই।

ইমদাদুল হক মিলন : সেই বইগুলো পরে বেরিয়েছিল কি ?

হুমায়ূন আহমেদ : বেরিয়েছিল কি না আমি জানি না। মনে পড়ছে না আমার।

ইমদাদুল হক মিলন : কিছু টুকরো টুকরো প্রসঙ্গে আজকে আমরা আলোচনা করতে চাই। এসব প্রসঙ্গের মধ্যে একটা হলো, আপনার সঙ্গে যারা মেশে—ভাইবোন, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, ছাত্র-সহকর্মী, অর্থাৎ চারপাশের মানুষ জানে যে আপনি হঠাৎ করে রেগে যান। আপনি খুব রাগী মানুষ। এই ইমেজটা কেন গড়ে উঠল ?

হুমায়ূন আহমেদ : আসলেই আমি রাগী মানুষ। এই যে এই ইন্টারভিউটার মধ্যে আমি তিন-চারটা চিৎকার দিয়ে ফেলেছি। রাগী না হলে দিতাম ? আমার ভেতর রাগটা আছে। অবশ্য রাগটা বেশিক্ষণ থাকে না। দুম করে ওঠে, আবার দুম করে পড়ে যায়।

ইমদাদুল হক মিলন : সাধারণত কী করেন আপনি রেগে গেলে ? কাউকে চড়থাপ্পড় মারেন বা কোনো রকম শাস্তি দেন ?

হুমায়ূন আহমেদ : একটা শাস্তি আছে আমার। কঠিন শাস্তি। যদি নুহাশ চলচ্চিত্রের কেউ ভয়াবহ অন্যায় করে ফেলে, তাকে আমাদের নুহাশপল্লীর মাঠে কানে ধরে একটা চক্কর দেওয়াই। এটা হচ্ছে সবচেয়ে কঠিন শাস্তি, যেটা আমি দিই। খুব খারাপ শাস্তি। এটার জন্য পরে নিজেও আমি খুব লজ্জিত বোধ করি।

ইমদাদুল হক মিলন : আপনি কি খুব অহংকারী মানুষ ? আপনার অহংকারবোধটা কেমন ?

হুমায়ূন আহমেদ : মাঝেমধ্যে আমি অহংকারী। আবার মাঝেমধ্যে একটা বিনয়ের স্রোত বয়ে যায় যে নিজেই ভাবি, কী জন্য আমি অহংকারটা করছি ? আসলে একই সঙ্গে আমাকে অহংকারী ও বিনয়ী বলতে পারো।

ইমদাদুল হক মিলন : আপাতদৃষ্টিতে আপনি গম্ভীর মানুষ। আপনার সঙ্গে কিছুক্ষণ মেশার পর বোঝা যায়, আপনি অসম্ভব ঠাট্টাপ্রিয় মানুষ। আপনি ঠাট্টা করেন, মজা করেন, চমৎকার গল্প বলতে পারেন। এই গুণগুলো কি ছোটবেলা থেকেই তৈরি হয়েছিল ?

হুমায়ূন আহমেদ : আমাদের ভাইবোনেরা প্রত্যেকেই খুবই গল্পবাজ। আমার মাও গল্প করতে খুবই পছন্দ করেন। আমার বাবাও গল্পগুজব করতে পছন্দ করতেন। ব্যাপারটা হয়তো বা জিনের মাধ্যমে এসেছে, জেনেটিক্যালি এসেছে। আর গম্ভীর টাইপের মানুষ যেটা বলেছ, আমি তো বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন অধ্যাপনা করেছি, ২০ বা ২১ বছরের মতো। অধ্যাপকদের মুখে সব সময় একটা আলাদা ভাব তৈরি করে রাখতে হয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই চামড়াটা ফেলে দিয়ে অরিজিনাল হুমায়ূন আহমেদ যখন বেরিয়ে আসে, তখন মনে হয় লোকটা খারাপ না। মিলন, আজকের মতো এখানেই শেষ করো।

৭

ইমদাদুল হক মিলন : আপনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন কত দিন ? ওই সময় ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কেমন ছিল ? শিক্ষক হিসেবে আপনি কেমন জনপ্রিয় ছিলেন ?

হুমায়ূন আহমেদ : আমি অধ্যাপনা করেছি কুড়ি বছরের মতো। আমি জনপ্রিয় ছিলাম কি না, এটা এই মুহূর্তে বলা মুশকিল। আমার কোনো ছাত্রছাত্রী পাওয়া গেলে ওদের জিজ্ঞেস করলে ওরা হয়তো বলতে পারত। আসলে হয়েছিল কি, আমি শেষের দিকে এমন একটা সাবজেক্ট পড়াতাম, যেটা ছিল খুবই জটিল। সাবজেক্টটা হচ্ছে কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রি। যেসব শিক্ষক এই সাবজেক্ট পড়ান, তাঁরা ছাত্রদের কাছে খুব দ্রুত আন-পপুলার হয়ে যান। কারণ এ ধরনের সাবজেক্ট খুব অ্যাবস্ট্রাক্ট। সাবজেক্ট অ্যাবস্ট্রাক্ট হওয়ায় কোনো ধরনের মেন্টাল ছবি দাঁড় করানো যায় না। অঙ্কের সাহায্যে জিনিসটা বুঝতে হয়। আর এমনিতেই তো আমাদের কেমিস্ট্রির ছাত্রদের ম্যাথমেটিকস জ্ঞানটা একটু কম থাকে, অর্থাৎ সেইভাবে জোরালো জ্ঞান

ম্যাথমেটিকসের ওপর থাকে না। বেশির ভাগ ছাত্রছাত্রীই বুঝতে পারে না, কী পড়ানো হচ্ছে। যখন বুঝতে পারে না, তখন সাবজেক্টটার ওপর একটা বিতৃষ্ণা তৈরি হয়। যিনি পড়াচ্ছেন, তাঁর প্রতিও বিতৃষ্ণা তৈরি হয়। এই জিনিসটা আমার ক্ষেত্রে ঘটেছে কি না আমি বলতে পারব না। আমি খুবই চেষ্টা করেছি, যতটা সম্ভব সহজভাবে এই অ্যাবস্ট্রাক্ট জিনিসটি বোঝানোর। আমার কাছে মনে হয়, হয়তো বা পেরেছি। আমার দিক থেকে এই জটিল বিষয় তাদের বোঝানোর চেষ্টায় খাদ ছিল না। আমি যখন দেখলাম, কোয়ান্টাম মেথড ওরা বুঝতে পারছে না, আমি তখন এই বিষয়ে একটি বই লিখে ফেললাম বাংলায়। আমি এ বইয়ে যতটা পারি সহজভাবে বিষয়টি বোঝানোর চেষ্টা করেছি। বইটি লিখেছিলাম শুধু আমার ছাত্রছাত্রীদের সাহায্য করার জন্যই। বইটি বোধ হয় আউট অব প্রিন্ট।

ইমদাদুল হক মিলন : আমার মনে আছে, এ বই বেরিয়েছিল কাকলী প্রকাশনী থেকে। ওই রকম বই বাংলা ভাষায় আপনার আগে কেউ লেখে নি, এই তথ্যটা কি আপনি জানেন ?

হুমায়ূন আহমেদ : আমি সেটা জানি না। অতি জটিল একটা বিষয় নিয়ে বাংলায় মজা করে লেখার চেষ্টা করেছি। অনেকেই সায়েন্স ফিকশন মনে করে এ বই কিনে নিয়ে ধরা খেয়েছে। হা হা হা।

ইমদাদুল হক মিলন : বইটি কি আপনার ছাত্রছাত্রীদের কাছে সেইভাবে পপুলার হয়েছিল ?

হুমায়ূন আহমেদ : আমি যত দিন ক্লাস নিয়েছি, তত দিন তারা বইটি পড়েছে।

ইমদাদুল হক মিলন : আপনি এমন একটি দুরূহ বিষয়ের শিক্ষক হওয়ার পরও এত জনপ্রিয় একজন লেখক হয়ে গেলেন—এ বিষয়ে আপনার ছাত্রছাত্রীদের আগ্রহ বা প্রতিক্রিয়া কেমন ছিল ?

হুমায়ূন আহমেদ : আমার প্রতি আগ্রহ তাদের বেশ ভালোই ছিল। রসায়ন অনার্স ক্লাসে ছাত্রছাত্রী কম, হঠাৎ দেখি আমার ক্লাসে ছাত্রছাত্রী বেশি বেশি লাগছে। ছাত্রসংখ্যা বড়জোর ৩০ হলেও দেখা যেত উপস্থিত আছে ৪২-৪৩ জন। দেখা গেল, এরা কেমিস্ট্রির ছাত্র নয়। কেউ জিওগ্রাফির, কেউ সয়েল সায়েন্সের; আবার দেখা গেল কেউ কেউ এসেছে আর্টস ফ্যাকাল্টি থেকে। ওরা এসেছে জাস্ট দেখার জন্য, এই লেখক মানুষটি কীভাবে ক্লাস নেয়। এটি যখন মোটামুটি জানাজানি হয়ে গেল, তখন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমাকে বলা হলো, আমি যেন আমার ক্লাসে বাইরের কাউকে অ্যালাউ না করি। কাজেই পরবর্তী সময়ে ক্লাস নেওয়ার শুরুতে দেখে নিতে হতো ক্লাসের ছাত্র কারা আর ক্লাসের বাইরের ছাত্র কারা। বাইরের ছাত্রদের বের করে দিতে হতো। এ সময় একটা আনন্দ পেতাম যে আমার কথা শোনার জন্য অন্য ডিপার্টমেন্টের ছেলেমেয়েরা এসে বসে আছে। বসে আছে শুকনো মুখে, আবার ভয়ও পাচ্ছে যে কখন আমি তাদের ধরে ফেলি! এটা আমার জন্য আনন্দময় অভিজ্ঞতা।

বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার প্রসঙ্গ যখন তুলেছ, এ প্রসঙ্গে আমার একটা আনন্দময় অভিজ্ঞতা আছে। ক্লাসে পড়াচ্ছি, থার্ড ইয়ার অনার্স। হঠাৎ কী কারণে একজনকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলাম। সে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারল না। মেজাজটা একটু খারাপ হলো। আমি বললাম, তোমার নাম কী ? যেই নাম জানতে চাইলাম, সঙ্গে সঙ্গে সে ছাড়া ক্লাসজুড়ে হো হো হাসি। বিষয়টা আমার জন্য বড় সারপ্রাইজিং, নাম জিজ্ঞেস করেছি–এতে সমস্ত ক্লাস হেসে ওঠার কী আছে ?

কী নাম ? কী নাম ? আবারও ক্লাসজুড়ে হাসি, আর ছাত্রটা একেবারেই চুপ। তারপর জানতে পারলাম, তার নাম মিসির আলি। ইন্টারেস্টিং ঘটনা। ছেলেটা মুখ শুকনো করে বসে আছে, আর তার আশপাশের সবাই হো হো করে হাসছে। এটি আমার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানোর সময়কার একটি অতি আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা।

আরেকটি আনন্দময় অভিজ্ঞতার কথা বলি, ৪০ মিনিটের ক্লাস তো...আমি যখন ক্লাস নিতাম, মাঝেমধ্যে আমার বড় মেয়ে নোভা যেত আমার সঙ্গে। তার হয়তো একটা কাজ আছে, ঘরে ভালো লাগছে না বা কোথাও যাবে; তো আমার সঙ্গে রওনা দিল। আমি ক্লাস নিচ্ছি, আর সে বারান্দায় হাঁটাহাঁটি করছে। ছাত্ররা প্রায়ই বলত, স্যার, আপনার মেয়ে আসুক না! বসুক এখানে। কতক্ষণ আর বাইরে হাঁটাহাঁটি করবে! আমি পাত্তা দিতাম না ওদের কথায়। নোভা বাইরেই হাঁটাহাঁটি করত। পরে কার কাছ থেকে শুনলাম, এই জিনিসটা তার কাছে খুবই ভালো লাগত—তার বাবা বক্তৃতা দিচ্ছে আর এতগুলো মানুষ মন দিয়ে শুনছে। সে মাঝেমধ্যে উঁকি দিয়ে দেখছে। একসময় নোভা যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টারি করতে শুরু করে, তখন সে আমাদের বলেছে, তার ক্লাস নেওয়ার সময় পুরনো দিনের স্মৃতি মনে পড়ত—একদিন আমার বাবার ক্লাসের বাইরে আমি হাঁটাহাঁটি করতাম আর ভাবতাম—ইস, আমিও যদি কোনোদিন এ রকম বক্তৃতা দিতে পারতাম! আমার মেয়েটার স্বপ্ন পূরণ হয়েছে। এটা আমার জন্য একটি আনন্দময় অভিজ্ঞতা। আমার মেয়ের জন্যও বিষয়টি আনন্দের। যে বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি নিজে মাস্টারি করে এসেছি, সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার মেয়ে মাস্টারি করেছে—এটা ভাবলে আমি আনন্দ পাই।

৮

ইমদাদুল হক মিলন : হুমায়ূন ভাই, আপনি বললেন আপনার ছাত্রের নাম মিসির আলি আর সবাই হো হো করে হেসে উঠল। এই ঘটনার অনেক আগেই আপনি মিসির আলি চরিত্রটা তৈরি ও প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছেন। এই যে একটা অন্য রকম নাম—মিসির আলি—এই নামটা আপনার মাথায় কিভাবে আসে ?

হুমায়ূন আহমেদ : লিখতে লিখতেই চলে এসেছে। প্রথম এই নামটা ব্যবহার করি একটি ভৌতিক উপন্যাসে। *দেবী* নামের একটা ভৌতিক উপন্যাস লিখছি, এ সময় অন্য চরিত্রগুলোর মতোই মিসির আলি নামের একটা চরিত্র দাঁড় করাই।

পরবর্তী সময়ে এই মিসির আলিকে নিয়ে যে আরও লেখালেখি করব, সেটা মাথার মধ্যে ছিল না। পরে লিখতে ইচ্ছা হলো, আবার লিখলাম। দেখলাম, মিসির আলি চরিত্রটা দাঁড়িয়ে গেছে। আলাদাভাবে চিন্তাভাবনা করে মিসির আলি তৈরি করি নি। তুমি যদি আগেকার মিসির আলির গল্প পড়ো তাহলে দেখবে, ওই মিসির আলি কিন্তু এখনকার মিসির আলির মতো নয়। ওইখানে কেবল তার শুরু হয়েছে। এখনকার মিসির আলি এক জিনিস, আর তখনকার মিসির আলি অন্য জিনিস।

ইমদাদুল হক মিলন : প্রচ্ছন্নভাবে পরের দিকে মিসির আলি চরিত্রটি তৈরি করার সময় অন্য কোনো বিখ্যাত লেখকের বিখ্যাত চরিত্র তৈরির ব্যাপারটি আপনার মাথায় কাজ করেছিল কি ? যেমন—শার্লক হোমস, প্রফেসর শঙ্কু বা এ-জাতীয় অন্য কোনো চরিত্র ?

হুমায়ূন আহমেদ : শার্লক হোমস তো একজন গোয়েন্দা, আর প্রফেসর শঙ্কু একজন পাগলাটে টাইপের বিজ্ঞানী। মিসির আলি সম্পূর্ণ অন্য রকম। গোয়েন্দাও নয়, আর পাগলাটে টাইপের বিজ্ঞানীও নয়। মিসির আলি অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথার একজন যুক্তিবাদী মানুষ, যার জীবনের পথচলার মূল হলো লজিক। প্রফেসর শঙ্কুর জীবনের চালিকাশক্তি হলো বিজ্ঞান। মিসির আলির চালিকাশক্তি লজিক। তিনি লজিক দিয়ে সব কিছু ব্যাখ্যা করতে চান। কিন্তু কোনো কোনো সময় থমকেও যান, যখন দেখেন এমন বিষয় বা পরিস্থিতির তিনি মুখোমুখি হচ্ছেন, যা তিনি লজিক দিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারছেন না। আমি মনে করি, মিসির আলি একটি মৌলিক চরিত্র। অন্য কোনো বিখ্যাত চরিত্রের ছায়া বা প্রভাব এতে নেই মোটেও।

ইমদাদুল হক মিলন : পরিকল্পনাহীনভাবে মিসির আলির মতো এত বড় আর শক্ত একটা চরিত্র তৈরি করা কী করে সম্ভব ? এটা কি বিশ্বাস করবে কেউ ?

হুমায়ূন আহমেদ : আসলে লিখতে বসেই মিসির আলি চরিত্রটির জন্ম হয়েছে, কেউ বিশ্বাস না করলে করার কিছু নেই। হিমুটাও একইভাবে এসেছে। প্রথমবার হিমুকে নিয়ে লিখতে বসে মোটেও চিন্তা করি নি যে এটা নিয়ে এতগুলো লেখা লিখব। এই লেখাটি যে মানুষের এতটা পছন্দ হবে কখনো ভাবি নি। আমার ছেলে নুহাশ একদিন এসে আমাকে একটা হলুদ পাঞ্জাবি দেখিয়ে বলল, এই পাঞ্জাবিটা বন্ধুরা আমাকে দিয়েছে। হিমুর মতো নানা রকম চিন্তাভাবনা করি তো, তাই বন্ধুরা এটা বানিয়ে দিয়েছে। হিমু পাঞ্জাবি। হিমু যে হলুদ পাঞ্জাবি পরে, এটা আজ সবাই জানে। হিমু আর মিসির আলির মতো চরিত্রকে যে আমি প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছি, এটা আমার বড় ধরনের অ্যাচিভমেন্ট। আজ থেকে ৫০ বছর পর আমার সাহিত্যের কী হবে আমি জানি না। এটা আঁচ করা মুশকিল। হয়তো কোনো কিছুই টিকে থাকবে না। যদি কোনো কিছুই টিকে না থাকে তবু আমার ধারণা, হিমু টিকে থাকবে। মিসির আলি টিকে থাকবে। দু-একটা অদ্ভুত গল্প টিকে থাকবে।

ইমদাদুল হক মিলন : 'হিমু' নামটি দেওয়া প্রসঙ্গে একদিন আমাকে বলেছিলেন, অনেক আগে সুবোধ ঘোষের একটা উপন্যাস পড়েছিলেন। নাম *শুনো বরনারী*। এ

উপন্যাসের প্রধান চরিত্রের নাম ছিল 'হিমাদ্রী'। লোকে ডাকত 'হোমিও হিমু' ওটা আপনার প্রিয় একটা চরিত্র। ওখান থেকেই কি আপনার মাথায় 'হিমু' নামটি এল, নাকি সাধারণভাবে লেখার জন্য লিখেছেন ?

হুমায়ূন আহমেদ : হিমালয় থেকেও হিমু হতে পারে। এটা আমি একটা বইয়ে লিখেছি। হিমালয় থেকে হিমু।

ইমদাদুল হক মিলন : মিসির আলির ভেতরেও অনেকখানি রয়েছে আপনার ছায়া, কারণ অসম্ভব যুক্তিবাদী মানুষ আপনি। আবার হিমুর মধ্যে রয়েছে আরেক হুমায়ূন আহমেদ। এই সব মিলিয়ে...

হুমায়ূন আহমেদ : আরেকজন আছে। তাকে বাদ দিলে কেন ? শুভ্র আছে না! শুভ্র ছেলেটার মধ্যেও আমি আছি। আমি একের ভেতর তিন।

ইমদাদুল হক মিলন : হিমু যে জীবন যাপন করে আর যে বয়সে আছে, শুভ্র যে জীবন যাপন করে আর যে বয়সের মধ্যে আছে এবং মিসির আলির জীবনযাপন ও বয়স—এসবের মধ্য দিয়ে আপনি যে গল্পগুলো তৈরি করছেন, এসব গল্প বা কাহিনির উপাদান আপনি কোথা থেকে সংগ্রহ করছেন ?

হুমায়ূন আহমেদ : আমাদের চারপাশে অহরহ অসংখ্য চমকপ্রদ ঘটনা ঘটছে। এসব ঘটনার মধ্যেই আমরা বেঁচে আছি। লেখকদের একটা প্লাস পয়েন্ট হচ্ছে, তাঁরা একটি ঘটনা যে অন্যটি থেকে আলাদা, তা চট করে বুঝে ফেলেন। এবং ঘটনাটি তাঁদের মাথায় রাখেন, সাধারণ মানুষ যা মাথায় রাখে না বা রাখতে চায় না।

একটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটি বুঝতে পারবে।

একদিন আমি রিকশায় করে যাচ্ছি। হঠাৎ করে আমার মনে হলো, রিকশাওয়ালা মানুষটার শুধু পিঠটাই আমি দেখতে পাচ্ছি। দীর্ঘ সময় এই রিকশায় যাচ্ছি, অথচ আমি তার ফেসটা দেখতে পারছি না। আমার সঙ্গী সে, অথচ তার মুখটাই দেখছি না। আমি যখন ভাড়া দিয়ে চলে যাব, তখন তার যে ফেসটা দেখব, সেটাও আমার মনে থাকবে না। এটা এমন কোনো জটিল বিষয় নয়। খুব স্বাভাবিক একটা ব্যাপার। কিন্তু থিংকিং প্যাটার্নটা শিফট করছে।

একদিন আমি বসে আছি আমাদের বাসায়। দেখি, বর্ষা বা বসন্তকালে নতুন পাতা গজিয়েছে আমগাছে। কী সুন্দর কচি পাতা! তখন হঠাৎ করে আমার মনে হলো, মাই গড! বৃক্ষদের তো প্রতিবছর একবার করে নতুন পাতা গজায়। প্রতিবছর একবার করে তাদের যৌবন আসে। অথচ আমাদের মানুষদের জীবনে যৌবন আসে মাত্র একবার। এটা যে খুব একটা দার্শনিক লেভেলের হায়ার থিংকিং তা কিন্তু নয়। তবু এসব ছোটখাটো বিষয় এমনভাবে মাথায় ঢুকে পড়ে যে পরে তা লেখার মধ্যে চলে আসে। আর জীবনে তো ছোটখাটো অনেক ঘটনাই ঘটে। সেগুলোও আমার মনে থাকে।

উদাহরণ দিই।

গতকাল সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে রান্নাঘরে গেছি চা খেতে। গিয়ে দেখি, আমাদের কাজের বুয়াটা একটা সরিষার তেলের শিশি খুলে মুখে ঢালছে। পুরো বোতল একটানে শেষ। আমি হতভম্ব। কাঁচা সরিষার তেল সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে কেউ খেয়ে ফেলবে, কী আশ্চর্য ব্যাপার! শুধু শুধু কাঁচা তেল খেতে কি মজা লাগে? পরে শুনলাম, বুয়ার খুবই ঠান্ডা লেগেছে। সর্দি হচ্ছে। সর্দিতে যদি কেউ কাঁচা সরিষার তেল খায়, তাহলে সর্দিটা ভালো হয়ে যায়।

এই ঘটনা একজন সাধারণ মানুষের কাছে কিছুই নয়। কিন্তু একজন লেখক হিসেবে এই ঘটনা আমাকে অন্যভাবে স্পর্শ করে। এখান থেকে আমি আমার লেখার একটা উপাদান খুঁজে পাই। আমার অবজারভেশনটা এ ধরনের। অন্যদেরও অবজারভেশন আছে, তার প্রয়োগ নেই। প্রয়োজন নেই বলেই নেই।

নুহাশপল্লীর একটা ঘটনা বলি। সেখানে রাজহাঁস আছে। রাজহাঁস ডিম পাড়ল এবং ডিম ফুটে বাচ্চা দিল। বাচ্চাগুলো নিয়ে মা রাজহাঁসটা ঘুরে বেড়ায়। আমি গভীর আগ্রহে ওদের দিকে তাকিয়ে থাকি। কী করে বাচ্চাগুলোকে সে বড় করছে? দেখি কি, ওখানে-সেখানে এটা-সেটা পড়ে থাকলে মা রাজহাঁস ঠোকর দিয়ে দেখে নিচ্ছে সেটা খাওয়ার যোগ্য কি না। খাওয়ার যোগ্য হলে মা রাজহাঁস কক্‌কক্ করে মুখ দিয়ে শব্দ করছে, আর অমনি বাচ্চাগুলো ওই খাবারের ওপর হামলে পড়ছে।

আরেক দিন হঠাৎ দেখি, একটা বাচ্চা কী যেন জিনিসের টুকরো পেয়েছে। একটা-দুইটা ঠোকর দিয়ে সেটা ফেলে দিয়েছে। জিনিসটা হলো, একটা ছোট্ট পলিথিনের টুকরো। ওই টুকরোটা আরেকটা বাচ্চা এসে ঠোকর দিল, খেতে না পেরে ফেলে দিল। তার দেখাদেখি আরেকটা এসে পলিথিনের টুকরোটায় ঠোকর দিতে লাগল। তার দেখাদেখি আরেকটা। এমন সময় দেখি মা রাজহাঁসটা দুই পাখা মেলে রাজকীয় ভঙ্গিতে ছুটে এল। বাচ্চাদের মুখ থেকে ছোঁ মেরে সে পলিথিনের টুকরোটা কেড়ে নিল। তারপর যেভাবে এসেছিল, ঠিক সেভাবেই দুই পাখা মেলে শোঁ শোঁ করে ওটাকে দূরে ফেলে দিয়ে ফিরে এল। তার মানে মা বাচ্চাদের শেখাল, এটা খাবার নয়। এটা নিয়ে টানাটানি করো না তোমরা। এই জিনিসটা আমাকে এত আনন্দ দিল! মে বি আমি আমার লেখক সত্তার দৃষ্টি দিয়ে ঘটনাটা দেখেছি বলেই এত আনন্দ পেয়েছি। আর যাঁরা লেখালেখি করেন না, তাঁরা হয়তো এই সামান্য ঘটনাকে গুরুত্বই দেবেন না। নিশ্চয়ই তাঁরা ধৈর্য নিয়ে ঘটনার শেষটুকু দেখার জন্য অপেক্ষা করতেন না। লেখকদের অন্য রকম ধৈর্য থাকে। ধৈর্য নিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে রাজহাঁসের বাচ্চাগুলো দেখছিলাম বলেই আমার এই ঘটনা দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল।

ইমদাদুল হক মিলন : হুমায়ূন ভাই, বাংলা ভাষায় যাঁরা কিছু বিখ্যাত চরিত্র তৈরি করেছেন, যেমন—সত্যজিৎ রায়ের শঙ্কু বা ফেলুদা, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের নীললোহিত বা সন্তু বা কাকাবাবু, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের টেনিদা, প্রেমেন্দ্র মিত্রের ঘনাদা প্রভৃতি। আমি যে প্রসঙ্গে কথা বলছি, ছোটদের আনন্দ দেওয়ার জন্য বাংলা সাহিত্যে এমন কিছু চরিত্র তৈরি করা হয়েছিল একসময়। বাংলা সাহিত্যের

ট্র্যাডিশনটা ওই রকম। আপনি ছোটদের জন্য এ রকম কোনো হিমু, মিসির আলি বা শুভ্র তৈরি করেন নি। অথচ আপনি ছোটদের জন্য প্রচুর সাহিত্য রচনা করেছেন। সে ক্ষেত্রে কেন ছোটদের জন্য কোনো চরিত্র তৈরি করলেন না ?

হুমায়ূন আহমেদ : জানি না কেন করলাম না।

ইমদাদুল হক মিলন : আপনার মতো একজন বড়মাপের লেখকের কাছে তো আমরা এ ধরনের কিছু চরিত্র আশা করতে পারি ?

হুমায়ূন আহমেদ : কেন, তুমি কি ছোট ? হা হা হা।

ইমদাদুল হক মিলন : ছোটদের জন্য লেখালেখি নিয়ে আপনার ভাবনা কী ? প্রথম ছোটদের জন্য কবে লেখা শুরু করেন ?

হুমায়ূন আহমেদ : প্রথম লেখাটা বোধ হয় 'নীল হাতি'। কবে বের হয়েছিল সেটা ঠিকঠাক বলতে পারব না। অবজারভার গ্রুপ বাচ্চাদের জন্য একটা পত্রিকা বের করেছিল। পত্রিকাটির নাম বোধ হয় *কিশোর বাংলা*। ওটার প্রথম সংখ্যার জন্য লেখাটা দিলাম। ভয়ে ভয়ে ছিলাম, বাচ্চাদের জন্য প্রথম লেখা তো... কেমন হয় ? ওটাই আমার প্রথম লেখা বাচ্চাদের জন্য। তারপর আমার নিজের বাচ্চারা যখন বড় হলো, তখন ওদের পড়ার জন্য ওদের উপযোগী করে বেশ কয়টি লেখা দাঁড় করাই। ওগুলোতে বেশির ভাগ চরিত্রের নাম ওদের নামেই—নোভা, শীলা, বিপাশা ও নুহাশ। একটা সময় বাচ্চাদের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রচুর বাচ্চাদের বই লিখি। বাচ্চারা কিন্তু কঠিন পাঠক। বাচ্চাদের মা-বাবা আমাকে ধমক দিতে ভয় পায়। কিন্তু বাচ্চারা পায় না। তারা ধমক দিয়ে আমাকে বলে, কী ব্যাপার, নতুন বই কই ? বই নাই কেন ? তখন আমি খুব আনন্দ পাই। আমি তখন তাদের বলি, আগামী বইমেলায় তোমাদের জন্য নতুন একটা বই থাকবে। ওদের মুখের দিকে তাকিয়েই আমাকে কথা রাখতে হয়। এগুলো বাচ্চাদের ফরমায়েশি লেখা বলতে পারো। তবে হ্যাঁ, বাচ্চাদের জন্য লেখার সময় আমাকে খুবই কেয়ারফুল থাকতে হয়। বড়দের জন্য লেখার চেয়ে ছোটদের জন্য লেখাটা অনেক কঠিন। বাচ্চাদের জন্য লেখার সময় আমি কখনোই তাদের বাচ্চা ভেবে লিখি না। আমি বাচ্চাদের ম্যাচিউরড পাঠক হিসেবে ধরে নিয়েই ওদের জন্য লিখি। বাচ্চাদের জন্য হেলাফেলা করে লেখা যায় না।

ইমদাদুল হক মিলন : কোনো লেখাই আপনি হেলাফেলা করে লেখেন না।

হুমায়ূন আহমেদ : কিছু কিছু লেখা অবশ্য সম্পাদক বা প্রকাশকদের চাপে তাড়াহুড়া করে লিখে ফেলতে হয়। ওগুলো হেলাফেলার পর্যায়েই পড়ে। অতি দ্রুত লেখার জন্য যা মনে আসে, তা-ই লিখি। গড়গড় করে লিখে যাই। এগুলো হেলাফেলা করেই লেখা।

ইমদাদুল হক মিলন : যদিও আপনি এগুলোকে হেলাফেলা করে লেখা বলছেন, কিন্তু পাঠকের কাছে এগুলো পপুলার হয়ে যাচ্ছে। হেলাফেলা করে লেখা কোনো কিছু পপুলার হতে পারে না। এটার রহস্য কী ?

হুমায়ূন আহমেদ : লেখা পড়তে ভালো লাগে—এটাই রহস্য। যেমন—হিমুর মতো চরিত্রের কাণ্ডকারখানা সবার ভালো লাগে। কতজনই হিমু হতে চায়।

ইমদাদুল হক মিলন : হ্যাঁ, আমি অনেক দেখেছি। জানেন, ছেলে হিমু ছাড়াও আমি একজন মেয়ে হিমুও দেখেছি। হলুদ শাড়ি, হলুদ ব্লাউজ, হলুদ ব্যাগ। হা হা হা। আচ্ছা, একবার আপনি 'হিমু পার্টি' নামে একটা দল করতে চেয়েছিলেন ?

হুমায়ূন আহমেদ : আসলে দেশের রাজনীতির এসব কাদা ছোড়াছুড়ি-নোংরামি আমার ভালো লাগে না। দেশের রাজনীতির প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে ভাবলাম, একটা রাজনৈতিক পার্টি যদি আমি করতে পারতাম 'হিমু পার্টি' নামে এবং হিমু পার্টির প্রত্যেক সদস্য হবে মাথা থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত স্বচ্ছ একেকজন মানুষ। তাদের ভেতর স্বার্থপরতা থাকবে না। তাদের ভেতর কোনো ধরনের ডিজ-অনেস্টি থাকবে না। ওরা যদি একজোট হয়ে রাজনীতিতে নামে, তাহলে অতি দ্রুত এই দেশটা ঠিক করে ফেলা যেত। এ আইডিয়া থেকেই হিমুর নামে ইচ্ছা হলো একটা পার্টি করি—হিমু পার্টি। রাজনীতি করি। ইলেকশন করি। দেশপ্রেমিক একজন হিমুকে খুঁজে বের করি, যার নেতৃত্বে দেশবাসী তরতর করে এগিয়ে যাবে। ভেদাভেদ ভুলে যাবে। হানাহানি ভুলে যাবে। উদ্ভট চিন্তাভাবনা। কিন্তু মুশকিল হলো, আমার এই চিন্তাভাবনাকে সবাই একটা ফাজলামি হিসেবে নিল। তারপর আমি দেখলাম যে নাহ, এটা সম্ভব নয়। রাজনীতি করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এরপর হিমু নামে একটা পত্রিকা বের করার কথাও ভেবেছিলাম, যাতে থাকবে হিমুবিষয়ক গল্প-কবিতা আর হিমুর মতাদর্শ। একেও উদ্ভট আইডিয়া হিসেবে যার কাছে বললাম, সে-ই সরিয়ে রাখল। ফলে পত্রিকাটি আর বের করা হলো না।

ইমদাদুল হক মিলন : এবার অন্য প্রসঙ্গে কথা বলি, আমরা জানি, আপনি ভূতের গল্পের খুব ভক্ত। আপনার সম্পাদনায় ভূতের গল্পের বইও প্রকাশিত হয়েছে। এ বইটিও পপুলার হয়ে ওঠে। বইটি সম্পর্কে কিছু বলবেন ?

হুমায়ূন আহমেদ : এখানে আমার কোনো ক্রেডিট নেই। আমার একটিমাত্র গল্প এ বইটায় আছে। যেসব বিখ্যাত লেখকের মারাত্মক মারাত্মক ভূতের গল্প এ বইটায় আছে, সব ক্রেডিট আসলে তাঁদেরই। গল্পগুলোতে বৈচিত্র্য ছিল, তাই পাঠকরা পছন্দ করেছে।

ইমদাদুল হক মিলন : এবার আপনাকে একটা একান্ত ব্যক্তিগত প্রশ্ন করি। আপনি মাকড়সা ভয় পান। এই ভয়টা আপনার কবে কীভাবে তৈরি হলো ?

হুমায়ূন আহমেদ : বলতে পারব না। শুধু আমি একা নই, মাকড়সা ভয় পেতেন আমার বাবা, ভাইবোন, পুরো গুষ্টির সবাই। আমার মা অবশ্য মাকড়সা ভয় পান না। অন্যরা সবাই ভয় পায়। বাচ্চারা বোধ হয় ভয় পাওয়াটা আমাদের কাছ থেকে শিখেছে। এই মাকড়সাভীতির একটা নাম আছে। নামটা হলো...এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না—যা-ই হোক, বিদেশে এটার জন্য সাইকিয়াট্রিস্টরা চিকিৎসা করে। ভয়টা

এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে যে তা মানুষের মানসিক ভারসাম্য নষ্ট করে দেয়। আমার অবশ্য সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে যাওয়া হয় নি।

ইমদাদুল হক মিলন : আপনার মাকড়সাভীতির একটা ঘটনার কথা আমার মনে আছে। তখন 'এই সব দিনরাত্রি' টিভিতে দেখানো হচ্ছিল। একটা কাজে আমি আপনার সঙ্গে প্রযোজক মোস্তাফিজুর রহমানের বাসায় যাই। আমার মনে আছে, কলিংবেল টিপতে গিয়ে আপনি প্রচণ্ড একটা চিৎকার দিয়ে লাফ মেরে সরে এলেন। আমি ভয় পেয়ে গেছি। ঘটনা কী ? পরে দেখি কী, কলিংবেলের ওপর একটা মাকড়সা। সেদিন থেকেই আমি বুঝতে পারলাম, মাকড়সাকে আপনি প্রচণ্ড রকম ভয় পান।

হুমায়ূন আহমেদ : জ্যান্ত মাকড়সাই নয়, মাকড়সার ছবিটা পর্যন্ত দেখলে আমার ভয় লাগে। এই ভীতি সীমাহীন।

ইমদাদুল হক মিলন : বাবার ব্যাপারে আপনি প্রচণ্ড দুর্বল। তিনি মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। মায়ের সঙ্গে আপনার রিলেশনটা কেমন ?

হুমায়ূন আহমেদ : ছোটবেলায় বেশির ভাগ সময় দেখা যেত, আমি মায়ের আশপাশে ঘুরঘুর করছি। মা কাজ করছেন, আমি মায়ের সঙ্গে আছি। মা রান্না করছেন, আমি পাশে বসা। মা নামাজ পড়ছেন, আমি পাশে দাঁড়িয়ে মন দিয়ে দেখছি। কাজেই মায়ের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কেমন তা নিশ্চয়ই বলার অপেক্ষা রাখে না।

আমার মা চমৎকার গল্প বলতে পারেন। আমি সেই গল্প শোনার জন্য উন্মুখ ছিলাম এবং এখনো আছি। আমার মা মানসিকভাবে একজন কঠিন প্রকৃতির মানুষ। শত প্রতিকূলতার মুখেও তাঁকে কখনো ভেঙে পড়তে দেখি নি। আমার বাবা তো বিষয়-সম্পত্তির প্রতি বরাবরই উদাসীন ছিলেন। বাবার মৃত্যুর পর একাত্তরের পর থেকে আমরা একটা কঠিন সময়ের মধ্যে পড়ে যাই। এ অবস্থায় দেখেছি, মা কীভাবে শক্ত হাতে আমাদের মানুষ করেছেন। এটা নেই, সেটা নেই...কত অভাব! অথচ আমাদের মা এটা আমাদের বুঝতে দেন নি। কোনো না কোনোভাবে আমাদের সব চাহিদা-প্রয়োজন তিনি মিটিয়েছেন। মায়ের কাছ থেকে আমরা অনেক শিখেছি। তিনি একজন মুক্তবুদ্ধির মহিলা।

মিলন, আজ আর না। আজ এখানেই শেষ।

৯

ইমদাদুল হক মিলন : আপনারা তিন ভাই ও তিন বোন। আপনার এক ভাই মুহম্মদ জাফর ইকবাল একজন বড়মাপের লেখক। লেখক ছাড়াও অধ্যাপক হিসেবে সারা দেশে জনপ্রিয়। কলাম লেখক হিসেবে জনপ্রিয়। আরেক ভাই আহসান হাবীব কার্টুন এঁকে বিখ্যাত হয়েছেন। রম্য লেখালেখিতে বিখ্যাত হয়েছেন। একই পরিবারের তিনজন মানুষ তিন রকমভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছেন। এ বিষয়ে আপনার অনুভূতি কেমন ?

হুমায়ূন আহমেদ : এরা প্রত্যেকেই নিজ যোগ্যতায় আজকের পর্যায়ে পৌঁছেছে, নিজস্বভাবেই তারা প্রতিষ্ঠিত। এরা প্রত্যেকে আলাদা মানুষ। সাধারণভাবে একই পরিবারে দু-তিনজন লেখক তৈরি হলে একজনের ছাপ অন্যজনের ওপর পড়ে। এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আমার ভাইদের মধ্যে ছাপের কোনো ব্যাপার নেই। জাফর ইকবাল লিখছে একেবারে তার নিজস্ব স্টাইলে। আমার লেখার কোনো ছাপ তার মধ্যে নেই। আহসান হাবীব লিখছে সম্পূর্ণ তার মতো করে। ছবিটবি আঁকছে তার নিজস্ব চিন্তা থেকে। বড় দুই ভাইয়ের কোনো ছাপ তার মধ্যে নেই। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের আলাদা জায়গায় কাজ শুরু করেছে এবং ভালো কাজ করছে। আমরা ভাইবোনরা, ইনক্লুডিং মাই সিস্টার্স, যারা লেখালেখির লাইনে আসে নি—এরা প্রত্যেকেই যে কাজটি করে, খুব সিনসিয়ারলি করে। এটা আমাদের পারিবারিক গুণ বলা যেতে পারে। আমরা ভাইবোনরা কোনো কাজ হাতে নিলে সেটা ঠিকভাবে করব—এটা স্বতঃসিদ্ধ।

ইমদাদুল হক মিলন : জাফর ইকবালের সায়েন্স ফিকশন বা তাঁর অন্যান্য লেখা কি আপনি পড়েন? পড়লে তাঁর লেখা সম্পর্কে বলুন।

হুমায়ূন আহমেদ : জাফর ইকবালের লেখা আমি পড়ি। তার লেখা অবশ্যই খুব ভালো। সে চমৎকার স্টোরি তৈরি করতে পারে। তার স্টোরির মধ্যে এক ধরনের সারল্য আছে। বাচ্চাদের জন্য লেখালেখির কাজটা সে বেশি করেছে। তাদের জন্য সারল্যটা খুবই প্রয়োজন। সারল্যের পাশাপাশি কিছু সূক্ষ্ম উপদেশের ভাবও তার লেখালেখিতে আছে। সে অধ্যাপনা করে। এই ব্যাপারটা অধ্যাপনা থেকে এসেছে কি না জানি না। তার লেখায় উপদেশ অংশটা আমার পছন্দ নয়। লেখকরা ঈশপ নয়। তার সায়েন্স ফিকশনগুলো সত্যিকার অর্থেই সায়েন্স ফিকশন। আমার সায়েন্স ফিকশনে মানবিক বিষয়গুলো ঢোকাই, কিন্তু তার সায়েন্স ফিকশন অন্য রকম। তার সায়েন্স ফিকশন হার্ড-কোর সায়েন্স ফিকশন।

আহসান হাবীবও ভালো লেখে। তার লেখায় সহজবোধ্য ব্যাপারটা আছে। রসিকতা আছে। আমার মনে হয়, আমাদের বোনরাও যদি লেখালেখি করত, তাহলে ভালোই লিখত। আমার শিখু নামে যে বোনটি আছে, সে কী মনে করে তার বড় ভাই সম্পর্কে বিশাল একটা লেখা লিখেছিল। আমি সেই লেখা পড়ে মজা পেয়েছিলাম। ভাষা-বর্ণনাভঙ্গি-ঘটনাবলি আমাকে মুগ্ধ করেছিল। এটা বই হিসেবে বের করার জন্য প্রকাশক আলমগীর রহমানকে দিয়েছিলাম। আলমগীর খুবই আগ্রহের সঙ্গে সেটা নিয়েছিল। বই প্রকাশের আগে কন্ডিশন দিয়েছিল, এটার মুখবন্ধটা যেন আমি লিখে দিই, আমি তাতে রাজি হই নি। ওই স্ক্রিপ্টটা কোথায় আছে জানি না। আমার সেই বোনটা আবার হাতের কাজ—বাটিকের কাজ করে। সেগুলো বিক্রিও করে। খুবই ইন্টারেস্টিং।

সুফিয়া নামের আমার যে বোনটি আছে, সে মিরপুর বাঙলা কলেজের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর। তারও বাংলা লেখার হাত ভালো। আমি যখন আমেরিকায় ছিলাম, তখন বাসায় কী ঘটছে না ঘটছে জানিয়ে সে চিঠি লিখত। চিঠিগুলো লেখার ভঙ্গি খুবই চমৎকার আর গোছানো।

আবার আমাদের সব ভাইবোনই কিন্তু টুকটাক ছবি আঁকতে পারে। জাফর ইকবাল একসময় তার পকেট খরচ চালাত *গণকণ্ঠ* পত্রিকায় কার্টুন এঁকে। আর আহসান হাবীব তো কার্টুন চালিয়েই যাচ্ছে।

ইমদাদুল হক মিলন : আপনার পরিবারের অনেকে ছবি আঁকেন। জাফর ইকবাল আঁকেন, আহসান হাবীব আঁকেন। আপনিও আঁকেন। কয়েক বছর আগে আপনি হঠাৎ রংতুলি নিয়ে ছবি আঁকতে শুরু করলেন। আপনার মধ্যে এক ধরনের ঘোর আমি দেখেছি, দিনের পর দিন আমি আপনাকে ছবি আঁকতে দেখেছি। হঠাৎ করে ছবি আঁকার প্রতি ঝুঁকেছিলেন কেন?

হুমায়ূন আহমেদ : তুমি যে সময়টার কথা বলছ, সেই সময়টা আমি খুবই নিঃসঙ্গতার মধ্যে কাটিয়েছি। একটা বিশাল বাড়িতে একা থাকতাম। আমার ফ্যামিলি মেম্বারদের সঙ্গে সেই অর্থে সে রকম যোগাযোগ ছিল না। নানা কারণে যোগাযোগটা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। একটা মানুষ তো সারা দিন, সারাক্ষণ লেখালেখির মধ্যে থাকতে পারে না। কিংবা সারাক্ষণ বই পড়তে পারে না। এদিকে বাইরে যে বের হব, তাও ইচ্ছা করে না। ঘরেই থাকতাম। এই যে একটা দীর্ঘ সময়, আমার কিছুই করার নেই। কিছু করার সমস্যাটা দূর করে নিজেকে ব্যস্ত রাখার জন্যই ছবি আঁকা শুরু করলাম।

ইমদাদুল হক মিলন : মুক্তিযুদ্ধের সময়টা আপনার উপন্যাস-চলচ্চিত্রে ঘুরেফিরে এসেছে। সে সময় আপনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। আপনার সেই জীবনটা সম্পর্কে জানতে চাই।

হুমায়ূন আহমেদ : মিলন, কিছু কিছু আদর্শ ছাত্র থাকে না, যাদের সমস্ত জীবন বইপত্রের ভেতর আটকে থাকে, এর বাইরে যেন কোনো জগৎ নেই। মুক্তিযুদ্ধের সময় আমি ছিলাম সে রকম তথাকথিত ভালো ছাত্র। শুধু কেমিস্ট্রি পড়া, এর বাইরে কোনো কিছুর সঙ্গে যোগাযোগ নেই, কোনো খেলাধুলা নেই। একটু অবসর পেলে পাবলিক লাইব্রেরিতে গিয়ে গল্পের বই পড়া—এই ছিল আমার জীবনের বৃত্ত। ঊনসত্তরের গণ-আন্দোলনেও একই ব্যাপার। বাইরে যখন আন্দোলন চলছে, তখন কিন্তু আমি ঘরের মধ্যে বসা।

ইমদাদুল হক মিলন : কিন্তু ছাত্ররা তখন বসে নেই।

হুমায়ূন আহমেদ : হ্যাঁ, সে সময় মিছিল হচ্ছে, মিটিং হচ্ছে, আন্দোলন হচ্ছে, গুলি হচ্ছে। আমি তখন মুহসীন হলে থাকতাম। গুলি খাওয়া লোকজনকে হলে আনা হয়েছে—এমন দৃশ্য চোখে দেখা। তার পরও আমি সমস্ত কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একা একা একটা নিজস্ব জীবন যাপন করেছি। পড়াশোনা করেছি, পত্রিকা ও গল্পের বই পড়েছি এবং খুব উচ্চস্তরের চিন্তাভাবনা করেছি, যেন গণ-আন্দোলনের সঙ্গে আমার কোনো যোগাযোগ নেই। আমি সম্পূর্ণ আলাদা।

ইমদাদুল হক মিলন : উচ্চ ধরনের চিন্তাভাবনা মানে?

হুমায়ূন আহমেদ : উচ্চ ধরনের চিন্তাভাবনা মানে তো তুমি জানো। জানো না? কিন্তু আমি যে এই দেশেরই সন্তান, দেশের সঙ্গে আমার একটা যোগ আছে, দেশের আন্দোলনে যোগ দেওয়াটা ছিল আমার জন্য কর্তব্য। সেই সামর্থ্যটা আমার ছিল না। অন্য কারণও হতে পারে। মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে আসা একটি ছেলে। বাড়ির বড় ছেলে। তার ঘাড়ে অনেক দায়িত্ব। তাকে মিটিং-মিছিল করলে চলবে না। তাকে পড়াশোনা করতে হবে। ভালো চাকরি পেতে হবে। একসময় সংসার টানতে হবে। মোট কথা হচ্ছে, সেই সময়ের আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলাম না। বাবা ছিলেন সরকারি চাকুরে। সে সময় সরকারি চাকুরে ছিলেন যাঁরা, তাঁরা সবাই ছিলেন অসম্ভব সরকারভক্ত। সরকার যেটা বলছে, সেটাই তাঁরা করেছেন, সরকার ভালো বললে ভালো আর মন্দ বললে মন্দ। আমার বাবাও সে রকম ছিলেন। তাঁর মোহমুক্তি ঘটে, যখন মিলিটারিরা রাজারবাগ পুলিশ লাইন আক্রমণ করে।

ইমদাদুল হক মিলন : আপনি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে?

হুমায়ূন আহমেদ : না, আমি তখন পিরোজপুরে। বরিশালে। রাজারবাগ পুলিশ লাইন থেকে যখন জানানো হলো, মিলিটারি আক্রমণ করেছে, তখন বাবা বিরাট ধাক্কা খেলেন। আমিও খেলাম। মনে হলো, আমাকে কঠিন একটা ধাক্কা দিয়ে বাস্তবে নিয়ে আসা হলো। বাস্তব ফেস করার যে ট্রেনিং, সেটাও আমার ছিল না। বাড়ির প্রথম ছেলে আমি। সব সময় আদরে আদরে থেকেছি। বাজার করতে হবে—মা বলছেন, না না ওকে পাঠাতে হবে না। ও বাজারের কী বোঝে? কিন্তু হঠাৎ যখন বাবা মারা গেলেন—যে ছেলেকে জীবনের সমস্ত ঝামেলা থেকে বাইরে রাখা হয়েছে, তার ওপর সমস্ত পরিবারের দায়িত্ব এসে পড়ল। এদের নিয়ে আমি কোথায় যাব? কোথায় গেলে নিরাপদ থাকব? আমি কি ইন্ডিয়া যাব? কী করে যাব? কে আমাদের আশ্রয় দেবে? মুক্তিযুদ্ধ আমি দেখেছি যুবকের চোখে। যুবকের চোখ, কিশোরের চোখ, বৃদ্ধের চোখ আলাদা। আমি মুক্তিযুদ্ধ যুবকের চোখে খুব কাছ থেকে দেখেছি। শূন্য হাতে দেশে যাওয়া, শর্ষিনার পীর সাহেবের বাড়িতে আশ্রয় নিতে যাওয়া, সেখান থেকে বিতাড়িত হওয়া। যখন ফিরে আসছি, মিলিটারির গানবোট থেকে গুলি হচ্ছে—সেই দৃশ্য দেখা। হিন্দু যারা আছে, তারা পালিয়ে বেড়াচ্ছে। প্রত্যেকের কাছে একটা বালিশ। যেখানে যাচ্ছে, আগলে রাখছে বালিশটা। টাকা-পয়সা, গয়না—সব বালিশের মধ্যে ভরা। মানুষ বগলে বালিশ নিয়ে জঙ্গলে ছোটাছুটি করছে। আহা রে, কী দৃশ্য! সারা দিন কাটত আতঙ্কে। সন্ধ্যার পর একটু স্বস্তি পেতাম। সন্ধ্যা মেলানোর পর মিলিটারি বের হতো না। কিছুদিন পর শুরু হলো রাজাকার-আলবদর বাহিনীর উপদ্রব।

ইমদাদুল হক মিলন : আপনার ওই সময়কার স্মৃতির কথা, আপনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস বলে যেটা মনে হয়, 'জোছনা ও জননীর গল্প', সেখানে কোনো কোনো অংশ আছে, যেখানে লেখক নিজেই যুক্ত হয়েছেন। তাঁর নিজের কথা, পরিবারের কথা আছে—তাঁর বাবার কথা আছে, ভাইবোনের কথা আছে, এমনকি শর্ষিনার পীরের ঘটনাও সেখানে আছে। তারপর কি আপনি ঢাকায় ফিরে এলেন? হল থেকে আর্মি আপনাকে ধরে নিয়ে গেল, সেই সময়টা কখন?

হুমায়ূন আহমেদ : আমি ঢাকায় ফিরে আসি নি। আমার নানা আমাদের ময়মনসিংহের মোহনগঞ্জে নিয়ে গেলেন। সেখানে যখন মিলিটারির আনাগোনা শুরু হলো, তখন আতঙ্কে আতঙ্কে দিন পার করা। পাকিস্তানি মিলিটারির কাছে যুবক ছেলে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র মানে ভয়ংকর জিনিস। ধরে নিয়ে মেরে ফেলবে—এই অবস্থা। নানাবাড়িতে যুবক ছেলে বিশ্ববিদ্যালয়ছাত্র তখন তিনজন—আমি, আমার ছোট ভাই জাফর ইকবাল এবং আমার মামা রুহুল আমিন। মিলিটারির হাত থেকে বাঁচার জন্য শেষ পর্যন্ত ঢাকায় চলে এলাম। গ্রাম থেকে ঢাকা অনেক বেশি নিরাপদ মনে হলো।

ইমদাদুল হক মিলন : আপনার ছোট ভাই তো তখন ছোট ? আহসান হাবীব ?

হুমায়ূন আহমেদ : হ্যাঁ, বেশ ছোট, সে ধর্তব্যের মধ্যে না।

ইমদাদুল হক মিলন : আপনি জাফর ইকবালকে নিয়ে ঢাকায় চলে এলেন, সেটা কোন মাস ? মুক্তিযুদ্ধের মধ্য পর্যায়ে বা যুদ্ধ যখন একেবারে তুঙ্গে তখন ?

হুমায়ূন আহমেদ : না, আসলে ঠিক মনে নেই।

ইমদাদুল হক মিলন : আমার মনে হয়, তখন মে-জুন হবে।

হুমায়ূন আহমেদ : হতে পারে, তখন বিশ্ববিদ্যালয় চালু হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাও শুরু হয়ে গেছে। এ রকম অবস্থা। মোটামুটি পাকিস্তানিরা পরিস্থিতি সামলে ফেলেছে প্রায়। এই অবস্থায় এলাম। আসার পর সরাসরি হলে উঠলাম।

ইমদাদুল হক মিলন : দুজনই ?

হুমায়ূন আহমেদ : হ্যাঁ, দুজনই। আমি মুহসীন হলে আর সে মুহসীন হলের পাশে—তখন হলটার নাম ছিল জিন্নাহ হল। কিছুদিন পরই মিলিটারি আমাকে রুম থেকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল।

ইমদাদুল হক মিলন : আপনি কি এই ঘটনাটা বলবেন ?

হুমায়ূন আহমেদ : এটা আমি বিভিন্ন জায়গায় লিখেছি। এই প্রসঙ্গটা থাকুক, আমার জন্য খুবই বেদনাদায়ক।

ইমদাদুল হক মিলন : ঠিক আছে। আর দু-একটি কথা এ ক্ষেত্রে জিজ্ঞেস করব, সেটা হচ্ছে স্বাধীনতার ঘোষণা নিয়ে যে বিতর্কটা চলে, আপনি কি স্বাধীনতার ঘোষণাটা আপনার নিজের কানে শুনেছেন ?

হুমায়ূন আহমেদ : হ্যাঁ, শুনেছি। তখন আমি ছিলাম পিরোজপুরে। আমি আমার বইপত্রেও লিখেছি।

ইমদাদুল হক মিলন : হ্যাঁ, আপনি লিখেছেন *জোছনা ও জননীর গল্পে*।

হুমায়ূন আহমেদ : জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণাটি আমার নিজের কানে শোনা, এই ঘোষণাটি বারবার রিপিট করছিল। এটা নিয়ে বিতর্ক হওয়ার তেমন কিছু নেই।

ইমদাদুল হক মিলন : কিন্তু এখানে বিতর্কটা হচ্ছে, জিয়াউর রহমান কি তাঁর নিজের ব্যাপারটা বলেছিলেন, নাকি On behalf of our great leader Sheikh Mujibor Rahman—এটা বলেছিলেন ?

হুমায়ূন আহমেদ : শুরুতেই বলেন নি। পরে বলেছেন।

ইমদাদুল হক মিলন : আপনি শুনেছেন ?

হুমায়ূন আহমেদ : এর মধ্যে কিন্তু কয়েকবার বলে ফেলেছি যে শুনেছি। আবারও বলছি—শোনো মিলন, জিয়ার ভক্তরা খুব রাগ করতে পারে, তার পরও আমি বলব, জিয়াউর রহমান যখন যুদ্ধ শুরু করেছিলেন, তখন কিন্তু আরও অনেকেই (মেজর, ক্যাপ্টেন...) যুদ্ধ শুরু করে দিয়েছিলেন। তাঁরা বিভিন্ন জায়গায় ছিলেন। জিয়াউর রহমান খুবই ভাগ্যবান একজন ব্যক্তি। তাঁর কাছে একটা রেডিও স্টেশন ছিল। তিনি প্রচারটা করতে পেরেছেন। আর বাকি যাঁরা যুদ্ধ করেছেন, তাঁদের সামনে রেডিও স্টেশনটা ছিল না। তাঁরা প্রচারটা করতে পারেন নি। তাঁরা কিন্তু যুদ্ধ শুরু করে দিয়েছিলেন। সেই অর্থে আমি বলব, জিয়াউর রহমান অসম্ভব ভাগ্যবান একজন মানুষ, যিনি এই ঘোষণাটি রেডিওতে দিয়েছেন। এই ঘোষণাটি আমাদের জন্য খুবই জরুরি ছিল। আমাদের দেশের মানুষের নৈতিক শক্তি ও মনোবল ভেঙে পড়েছিল। তিনি সেটাকে শক্তভাবে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন। এই সম্মান তাঁকে দিতে হবে। কাউকে সম্মান জানিয়ে কেউ ছোট হয় না। আওয়ামী লীগের যাঁরা, তাঁরা হয়তো ভাবছেন, জিয়াউর রহমানকে এই সম্মান জানালে তাঁরা ছোট হবেন। ব্যাপারটা মোটেই সে রকম নয়। সেই দুঃসময়ে জিয়াউর রহমান নামের সাহসী মানুষটির ঘোষণা জাতির জন্য প্রয়োজন ছিল।

ইমদাদুল হক মিলন : আপনি জিয়াউর রহমানের বেশ ভালো একটা মূল্যায়ন করলেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কে আপনার মূল্যায়নটা কী ? তাঁকে কি আপনি জাতির পিতা মনে করেন ?

হুমায়ূন আহমেদ : যিনি জাতির পিতা তাঁকে কেন জাতির পিতা বলব না ?

ইমদাদুল হক মিলন : আপনি মনে করেন, তিনি জাতির পিতা বা তাঁকে সেই মর্যাদা দেওয়া উচিত ?

হুমায়ূন আহমেদ : অবশ্যই সেই মর্যাদা দেওয়া উচিত। এ বিষয়ে কারও মনে কোনো সংশয় থাকা উচিত নয়।

ইমদাদুল হক মিলন : আপনার পরিবারের ক্ষেত্রে যেটা হলো, দেশ স্বাধীন হলো এবং আপনার বাবা মারা গেলেন। আপনার বাবার মৃত্যু পুরো পরিবারকে একেবারে ছারখার করে দিল। তারপর আপনার মা আপনাদের ছয় ভাইবোনকে নিয়ে টিকে থাকার সংগ্রাম করতে থাকেন। স্বাধীনতার পরপর আপনার পরিবারের কতকগুলো পেইনফুল ঘটনার কথা আমরা সব সময় শুনি। বাড়িওয়ালা বা পুলিশ এসে বাসা থেকে বের করে দিয়েছে, অথবা রাস্তায় বসে থাকলেন। এই ঘটনাগুলোর ব্যাপারে কি আপনি বলবেন ?

হুমায়ূন আহমেদ : সে সময় বাংলাদেশ সরকার আমাদের একটা বাড়ি দিয়েছিল থাকতে, মোহাম্মদপুরের বাবর রোডে দোতলা বাড়ির দোতলাটা। ওই ফ্ল্যাটে না ছিল বিদ্যুৎ, না ছিল পানি। গ্যাস তখনো আসা শুরু হয় নি। তো, নিচ থেকে আমরা

বালতিতে করে পানি আনতাম খুব কষ্ট করে। তার পরও একটা বাড়ি তো। ভাড়া দিতে হচ্ছে না। এতেই আমরা আনন্দিত ছিলাম। কোনো এক রাতে রক্ষীবাহিনী এসে বাড়ি থেকে সবাইকে বের করে দিল।

ইমদাদুল হক মিলন : রক্ষীবাহিনী তো ১৯৭৪ সালের কথা। তার মানে এটা '৭৪ বা '৭৫ সাল, তাই না?

হুমায়ূন আহমেদ : হ্যাঁ, সে সময়ই। রক্ষীবাহিনী বাড়ি থেকে বের করে দিল। সমস্ত ভাইবোন নিয়ে রাস্তায় বসে আছি আমরা। একজন তো ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে কাঁদছে। কেউ সেভাবে আশ্রয় দিচ্ছে না। তখন আমরা কাদের সিদ্দিকীর কাছে গিয়েছিলাম, তিনি কিছু করতে পারেন কি না। তিনি তখন ক্ষমতাবান। বাবর রোডেই থাকেন সরকারের দেওয়া বিশাল এক বাড়িতে। তিনি খুবই বিরক্ত হলেন আমাদের ওপর। এসব ঝুটঝামেলা কেন যে তাঁর কাছে আসে—এই ধরনের আর কি!

ইমদাদুল হক মিলন : মানে আপনাদের ওপর সরাসরি বিরক্তি প্রকাশ করলেন!

হুমায়ূন আহমেদ : তা করলেন। তখন দুনিয়ায় মানুষ নানা দেনদরবার নিয়ে তাঁর কাছে যেত। বিরক্ত হতেই পারেন।

ইমদাদুল হক মিলন : আপনি মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাসসমগ্র উৎসর্গ করেছেন কাদের সিদ্দিকীকে, সেটার কারণটা কী? তাঁর ওই সময়ের বীরত্বের জন্য?

হুমায়ূন আহমেদ : অবশ্যই।

ইমদাদুল হক মিলন : আর আপনার সঙ্গে তিনি ব্যক্তিগত যে আচরণ করেছেন, সেটা মাথায় রাখেন নি?

হুমায়ূন আহমেদ : না, রাখি নি। আমার সঙ্গে ক্ষুদ্র ব্যবহারের কারণে তাঁর বড় জীবনকে আমি ক্ষুদ্র করে দেখব—এত ছোট আমি না।

ইমদাদুল হক মিলন : আপনার যে বইগুলো শুরুর দিকে বেরোল তার মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাসও রয়েছে। আমার ধারণা, আপনার প্রথম মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস হচ্ছে *নির্বাসন*।

হুমায়ূন আহমেদ : হ্যাঁ, *নির্বাসন*।

ইমদাদুল হক মিলন : *নির্বাসন*-এর নামটা উল্লেখ করছি এ জন্য যে *নির্বাসন* মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস ঠিকই, এটি এক অর্থে একটি প্রেমের উপন্যাসও।

হুমায়ূন আহমেদ : হ্যাঁ।

ইমদাদুল হক মিলন : এরপর আপনি কতগুলো গল্প লিখলেন—'জলিল সাহেবের পিটিশন', 'ফেরা', 'সৌরভ'; মুক্তিযুদ্ধের অনেক গল্প লিখলেন। তারপর 'আগুনের পরশমণি' লিখলেন। 'শ্যামল ছায়া' আর 'অনীল বাগচীর একদিন' লিখলেন। মুক্তিযুদ্ধকে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখার একটা চেষ্টা আপনি করলেন। এই যে মুক্তিযুদ্ধকে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলেন, সেখানে মূল সুরটা কী? একজন লেখক হিসেবে আপনি কী বলতে চাইলেন লেখার মধ্যে?

হুমায়ূন আহমেদ : জটিল প্রশ্ন হয়ে গেল না ?

ইমদাদুল হক মিলন : প্রশ্নটি যদি জটিল হয়ে থাকে, তাহলে বলি, আপনার মুক্তিযুদ্ধের লেখাগুলোতে, ধরুন আপনার একটি গল্পের কথা বলি, 'জলিল সাহেবের পিটিশন'—এই গল্পটার কথা তো আপনার মনে আছে ? এই গল্পটার বক্তব্যটাই আপনি বলেন যে আপনি আসলে এই লোকটার মধ্য দিয়ে কী কথাটি বলার চেষ্টা করেছেন। কিংবা *শ্যামল ছায়ার* অন্তর্নিহিত বক্তব্যটা কী ? মানে লেখকের ব্যাখ্যাটা আমাদের জানা দরকার।

হুমায়ূন আহমেদ : মিলন, আমার মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস *শ্যামল ছায়া* যখন লিখেছি, সে সময় একদল মুক্তিযোদ্ধা, যারা যুদ্ধ করছে, তাদের প্রচণ্ড ভালোবাসা দেশের জন্য এবং দেশের জন্য যে-কোনো সময় তারা তাদের জীবন বিসর্জন দিতে তৈরি—তাদের সেই ডেডিকেশন, সেটাই আমি আনতে চেয়েছি।

'সৌরভ'-এ আমি লিখেছি একদল মানুষের কথা, যারা যুদ্ধে যেতে পারে নি। একজন খোঁড়া লোক, সে কিন্তু ঘরে বসা—যুদ্ধে যেতে পারছে না। তার পরও তার সমস্ত মন, সমস্ত ইন্দ্রিয়, সমস্ত শরীর কিন্তু পড়ে আছে যুদ্ধের ময়দানে। সে মানসিকভাবে একজন যোদ্ধা। একদল যারা সরাসরি যোদ্ধা, আরেক দলও যোদ্ধা, যারা মানসিকভাবে যুদ্ধ করছে। 'অনীল বাগচীর একদিন'-এ ধরার চেষ্টা করেছি হিন্দু সম্প্রদায়ের অবস্থাটা। *আগুনের পরশমণি* উপন্যাসে বলার চেষ্টা করেছি ঢাকায় যখন গেরিলা অপারেশন শুরু হলো, ওই যে একদল ছেলে, যাদের মাথার ভেতরে চে গুয়েভারা; এদের কাছে দেশের চেয়েও হয়তো বড় হচ্ছে অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করা। দেখো আমরা কী করছি। দেশপ্রেম অবশ্যই আছে। কিন্তু ওই জিনিসটিও আছে। এটাই বলতে চেয়েছিলাম *আগুনের পরশমণিতে*। আর সব কিছু মিলে পরে লেখার চেষ্টা করলাম *জোছনা ও জননীর গল্প*।

ইমদাদুল হক মিলন : *জোছনা ও জননীর গল্প* ছাড়াও ১৯৭১ নামেও খুব ভালো একটা লেখা আছে আপনার। এই লেখাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি লেখা। আর আপনার লেখার মূল সুর হচ্ছে, সর্বত্রই মানুষের প্রতি আপনার অন্য রকমের মূল্যায়ন থাকে, মানুষের প্রতি এক রকম মমত্ববোধ থাকে। আপনি খারাপ দিকটা দেখাতে চান নি। প্রথম দিকের লেখাগুলোতে চানই নি। মধ্য পর্যায়ের লেখাগুলোতেও চান নি। আপনার কাছে সব মানুষ একটি পর্যায়ে এসে মহৎ হয় যাচ্ছে—মানুষকে আপনি একটি মহত্ত্বের জায়গায় দাঁড় করিয়ে দেন। সে জিনিসটা আপনার মুক্তিযুদ্ধের কোনো কোনো লেখার ক্ষেত্রে আমরা খেয়াল করেছি। যে-কোনো দেশদ্রোহী, সেই সময় আমরা যাদের রাজাকার বলতাম, শান্তি কমিটির লোক বলতাম, তাদের প্রতিও আপনি মমত্ব দেখিয়েছেন। এটার কারণটা কী ?

হুমায়ূন আহমেদ : মানুষের দুটি দিক আছে। অন্ধকার দিকও আছে, আলোকিত দিকও আছে। মানুষের আলোকিত দিক নিয়ে কাজ করার একটা আনন্দ আছে। আলোর স্পর্শটা শরীরের দিক থেকে বোঝা যায়। মানুষের অন্ধকার দিক নিয়ে কেউ যখন কাজ করে, সে ওই অন্ধকার দিকের স্পর্শটা শরীরে কিন্তু অনুভব করে। আমি মনে হয় এই

স্পর্শ এড়ানোর জন্যই বেশির ভাগ সময় আলোকিত অংশ নিয়ে কাজ করার চেষ্টা করেছি। আমার নিজের ভেতরেই তো অন্ধকার আছে, বাড়তি অন্ধকার স্পর্শ করব কেন? বরং আলো স্পর্শ করি, অন্ধকারটা কমাই। এটি একটি কারণ হতে পারে।

ইমদাদুল হক মিলন : কিন্তু আপনি বলছেন যে আপনি মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস লিখে, যেমন—*জোছনা ও জননীর গল্প* উপন্যাসে বলতে চেয়েছেন, আপনি দেশমাতৃকার ঋণ কিছুটা শোধ করলেন। দেশমাতৃকার ঋণ শোধ করার জন্য দেশমাতৃকার শত্রুদের মহৎভাবে দেখার অর্থ কী?

হুমায়ূন আহমেদ : তাদের মহৎ করে দেখানোর চেষ্টা আমি করি নি। মানুষকে মানুষ হিসেবে দেখেছি। তাদের সত্যিকারের অংশটি—এই যে রাজাকারদের অত্যাচার, আলবদরদের অত্যাচার—এসব অংশ পুরোপুরিভাবে আছে। কিন্তু যেভাবে থাকলে তোমার ভালো লাগত সেভাবে হয়তো নেই।

ইমদাদুল হক মিলন : *জোছনা ও জননীর গল্প* নিয়ে একটু কথা বলে আমরা এ প্রসঙ্গটা শেষ করি। আপনি বহুদিন পরিকল্পনা করে লেখাটা লিখেছেন। আপনি যে মাপের লেখক—আপনি খুব সহজে তৃপ্ত হন না। আপনি কি এ উপন্যাসটা লিখে খুশি হয়েছেন?

হুমায়ূন আহমেদ : হ্যাঁ, আমি খুশি।

ইমদাদুল হক মিলন : আপনার মনে হয়েছে, আপনি যেভাবে লিখতে চেয়েছেন সেভাবে লিখতে পেরেছেন?

হুমায়ূন আহমেদ : এক শ ভাগ। আসলে প্রত্যেককে নিজের প্রতিভা দেওয়া হয়েছে। প্রতিভার বাইরে কেউ কাজ করবে না। যে প্রতিভা দিয়ে আল্লাহ আমাকে পাঠিয়েছেন, আমি কাজ করব তার ভেতরেই। আমি যদি মনে করি, এটা দিয়ে আমি একটা উপন্যাস লিখব, সেটা হবে *ওয়ার অ্যান্ড পিস*, তা ঠিক হবে না। আমাকে যদি আল্লাহপাক *ওয়ার অ্যান্ড পিস* লেখার ক্ষমতা দিয়ে দেন, সেটা হবে ওয়ার অ্যান্ড পিসের মতো লেখা। আমাকে যেটুকু প্রতিভা আল্লাহ দিয়েছেন, সেই প্রতিভার পুরোটা আমি কাজে লাগিয়েছি। অনেক উপন্যাসে আমার ঘাটতি আছে, এ উপন্যাসে আমার কেনো ঘাটতি নেই।

ইমদাদুল হক মিলন : আপনি এ উপন্যাসে নানা ধরনের আঙ্গিক ব্যবহার করেছেন। মুক্তিযুদ্ধের এ উপন্যাসে আপনি কখনো কখনো মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস তুলে দিয়েছেন, কখনো বা বেশ অভিনব পদ্ধতিতে লেখক ইনভলভড হয়েছেন লেখাটিতে। আপনি সব সময় বলেন আপনি স্বতঃস্ফূর্ত লেখক। এই উপন্যাসে আপনার লেখা কি ওভাবেই এসেছে? নাকি আপনি আগে থেকেই আঙ্গিক ঠিক করেছিলেন?

হুমায়ূন আহমেদ : আমি আঙ্গিক আগে থেকেই ভেবেছিলাম। আমি দেখলাম জাতিসংঘে কী হলো, সাধারণ সভায় কী হলো–সেটা আমি সঠিক একটা লাইন দিয়ে দিতে চাইলাম। ভাবলাম মূল লেখার ভঙ্গি এসব একত্রে মিলিয়ে দেখি না, জিনিসটা কেমন হয়।

ইমদাদুল হক মিলন : তার মানে, এ উপন্যাসটির সব কিছু আপনার পরিকল্পিত।

হুমায়ূন আহমেদ : হ্যাঁ পরিকল্পিত। এ উপন্যাস লেখার কাজটি আমি অনেকবার শুরু করেছি, আবার বন্ধ করে দিয়েছি।

ইমদাদুল হক মিলন : একেবারে প্রথম দিকেই কি আপনি এ আঙ্গিকটা মাথায় রেখে শুরু করেছিলেন ?

হুমায়ূন আহমেদ : না, যখন মূল লেখাটায় আসি, তখন মাথায় ছিল আমাকে এভাবে যেতে হবে, এই হবে আঙ্গিক, নয়তো এটা আমি পারব না। মিলন, মাফ করো। আজ আর না।

১০

ইমদাদুল হক মিলন : ঔপন্যাসিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে আপনি কি বড় লেখক মনে করেন ?

হুমায়ূন আহমেদ : অবশ্যই।

ইমদাদুল হক মিলন : কী কী কারণে মনে করেন ?

হুমায়ূন আহমেদ : প্রথমত উনি একজন বড় কবি। একজন কবি যখন গদ্য লেখেন, তখন কবিতাক্রান্ত গদ্য লেখেন। তাঁর ক্ষেত্রে প্রথম দেখলাম একজন বড় কবি গদ্য লিখছেন, কবিতাক্রান্ত গদ্য না। সহজ সরল। তারপর দেখলাম, তাঁর কাহিনি তৈরি করার অস্বাভাবিক ক্ষমতা রয়েছে। শুধু কাহিনি তৈরি করা না, কাহিনির মধ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা–দুইটা-তিনটা-চারটা লাইন দিয়ে কাহিনির মধ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা বড় লেখক না হলে সম্ভব না।

ইমদাদুল হক মিলন : আপনার সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্ক ভালো এবং আপনি সব সময় তাঁর ব্যাপারে উচ্ছ্বসিত। কিন্তু বাংলা ভাষার বা সাহিত্যের বড় পণ্ডিতরা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে সে অর্থে বড় লেখক মনে করেন না—এ বিষয়ে আপনি কী বলবেন ?

হুমায়ূন আহমেদ : বাংলা ভাষার বা সাহিত্যের পণ্ডিতরা বিভিন্ন সময়ে অনেককেই বড় লেখক মনে করেন নি। রবীন্দ্রনাথকেও অনেকে বড় লেখক মনে করেন নি। একসময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা এমএ পরীক্ষায় রবীন্দ্রনাথের গদ্য তুলে দিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল শুদ্ধ বাংলায় লেখো। মানে তাঁদের ধারণা ছিল, রবীন্দ্রনাথের লেখাগুলো অশুদ্ধ।

ইমদাদুল হক মিলন : আপনার বিবেচনায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় খুব বড় লেখক। তাঁর কোন কোন দিক আপনার খুব বড় লেখকের মতো মনে হয় ? এ প্রসঙ্গে আমি একটা কথা বলি, আপনি একদিন আমাদের বলছিলেন—সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় যদি পৃথিবীর বড় ভাষাগুলোর দেশে জন্মাতেন, ফরাসি বা স্পেন বা ইংরেজি ভাষার কোনো দেশে, তাহলে নোবেল প্রাইজ পেতে পারতেন। আপনার এটা মনে হয় ?

হুমায়ূন আহমেদ : আমার মনে হয়। আসলে মিলন, আমাদের বাংলা ভাষায় কিন্তু অতি উচ্চমানের সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের বাংলা ভাষায় যেসব লেখক

রয়েছেন, তাঁদের অনেকেরই নোবেল প্রাইজ পাওয়ার কথা। অবশ্যই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্করের পাওয়া উচিত ছিল।

ইমদাদুল হক মিলন : এবং এঁদের পাশাপাশি সুনীলকেও মনে হয় ?

হুমায়ূন আহমেদ : হ্যাঁ, আমার মনে হয়।

ইমদাদুল হক মিলন : আপনি আরেকজন লেখকের ব্যাপারে খুব বলতেন, সতীনাথ ভাদুড়ী। এই লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রিয় একজন লেখক। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সব সময় তাঁর প্রিয় লেখকদের তালিকায় তাঁর নাম রাখেন। এবং তাঁর প্রিয় উপন্যাসের নাম বলেন, *ঢোড়াই চরিত মানস*। আপনি একমত তাঁর সঙ্গে ?

হুমায়ূন আহমেদ : এই উপন্যাস আমাকে খুব একটা আকর্ষণ করে নি। এই উপন্যাসে তিনি এমন একটি ল্যাংগুয়েজ ব্যবহার করেছেন, যার সঙ্গে আমরা পরিচিত না। আমার মনে হয় সতীনাথ ভাদুড়ী *ঢোড়াই চরিত মানস* উপন্যাসে টেকনিক্যাল দিকটাতে অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন উপন্যাস লেখার সময়। কিন্তু উনি সহজ যেসব লেখা লিখেছেন, যেমন—*অচিন রাগিণী, জাগরী* খুবই শক্তিশালী লেখা। উনি খুবই বড়মাপের একজন লেখক, বিশেষ করে ছোটগল্পে।

ইমদাদুল হক মিলন : যে এক শ্রেণীর লোকের মুখের ভাষা বইতে থাকে, ধরেন আমি যদি *লীলাবতী* বইটার প্রসঙ্গে আবার আসি—আপনি এই বইটায় ওই এলাকার লোকজনের মুখের ভাষা এনেছেন এবং বর্ণনার সময় অবলীলাক্রমে ব্যবহার করে গেছেন। এটা কেন করলেন ?

হুমায়ূন আহমেদ : আমি তা করেছি একটা সহজিয়া ভঙ্গিতে, যাতে যে পড়ে সে-ই বুঝতে পারে। যেমন—এখানে হয়তো তুমি একটা-দুটো শব্দ বুঝবে না, কিন্তু আবার অর্থটা সম্পূর্ণ বুঝবে। আমি কথ্য ভাষাটারই একটা আধুনিক ধরন দাঁড় করার চেষ্টা করেছি, যাতে পড়ে সবাই বুঝতে পারে। যেমন—তুমি যদি সিলেটি বা চিটাগাংয়ের ভাষায় বই লেখো তাহলে আমরা বাংলাভাষীরাও কিন্তু পড়ে কিছু বুঝব না। কাজেই সাহিত্য রচনার জন্য আমাদের একটা স্ট্যান্ডার্ড ভাষা দরকার।

ইমদাদুল হক মিলন : মানে, যা সব পাঠক বুঝবে ? কমিউনিকেট করবে সবাইকে ?

হুমায়ূন আহমেদ : হ্যাঁ। যেমন—সিলেটে দেখেছি, সিলেটি ভাষায় নাটক হচ্ছে। চট্টগ্রামের ভাষায়ও নাটক দেখেছি। কিন্তু ওই সব ভাষা শুনে আমার খটকা লাগে। কিছুই বুঝতে পারি নি। সিলেট বা চট্টগ্রামের লোকরা অবশ্য বুঝেছে। এখন একটা হুবহু আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করে আমার সাহিত্যকে ছোট করে ফেলব কেন ? ছড়িয়ে দেব।

ইমদাদুল হক মিলন : বাংলা ভাষায় আপনার প্রিয় লেখক কারা, যাঁদের লেখা আপনি প্রায় সবই পড়েছেন ?

হুমায়ূন আহমেদ : একদম শুরু থেকে বলি—বঙ্কিমচন্দ্র। কেননা তাঁর গল্প তৈরির ক্ষমতা অসাধারণ। তারপর আমাদের শরৎচন্দ্র।

ইমদাদুল হক মিলন : হুমায়ূন ভাই, আমরা তো দীর্ঘদিন ধরে কথা বললাম অনেক বিষয়ে। আজকে যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে চাই সেটি হলো মৃত্যুচিন্তা। আমি জানি যে আপনি মৃত্যু নিয়ে ভাবেন। জাগতিক বিষয়ের পাশাপাশি মৃত্যু-পরবর্তী জগৎ নিয়েও আপনি ভাবেন। আপনার মৃত্যুচিন্তাটা কী রকম ?

হুমায়ূন আহমেদ : আমি থাকব না, এই পৃথিবী পৃথিবীর মতো থাকবে। বর্ষা আসবে, জোছনা হবে; কিন্তু সেই বর্ষা দেখার জন্য আমি থাকব না, জোছনা দেখার জন্য আমি থাকব না। এই জিনিসটি আমি মোটেও নিতে পারি না। আগেও কখনো পারতাম না, এখনো যতই ওই দিকে এগিয়ে যাচ্ছি, ততই আর পারছি না।

ইমদাদুল হক মিলন : মানে, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কি আপনার এই বোধটা তীব্র হচ্ছে যে আপনি আর নিতে পারছেন না ?

হুমায়ূন আহমেদ : মিলন, আমি তো মৃত্যুর খুব কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছি। আমরা সবাই আছি। আমি কিন্তু মৃত্যুকে দেখেছি। আমার মতো অনেকেই দেখেছেন। মৃত্যুকে দেখা ভয়াবহ ব্যাপার, নিজের মৃত্যুকে দেখা। ১৯৭১ সালে মিলিটারির হাতে যখন ধরা পড়েছিলাম, পাকিস্তানি মিলিটারি আমাকে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছিল। আমি ফিরে আসি সেখান থেকে। তখন আমি মৃত্যুকে দেখেছি একদম চোখের সামনে। বয়সও ছিল কম। প্রচণ্ড ভয় পেয়েছিলাম। তারপর কয়েকবার আমার হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল। একবার তো খুবই ভয়াবহ অবস্থা ছিল। আমি ধরেই নিয়েছিলাম যে মারা যাচ্ছি। আমার আশপাশে যাঁরা ছিলেন, তাঁরা জোরে জোরে কালেমা পাঠ করছিলেন। কালেমার শব্দ শোনাতে শোনাতে আমাকে নিয়ে যাওয়া হলো সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে। ডাক্তাররা বললেন, অবস্থা খুবই খারাপ। আত্মীয়স্বজনকে খবর দেন। তখন আমার মা-ভাই-বোন সবাইকে খবর দেওয়া হলো। আমি সেখান থেকে বেরিয়ে এসেছি। তারপর হলো আমার বাইপাস অপারেশন। বাইপাস অপারেশনের সময় যখন অ্যানেসথেশিয়ার কাজ শুরু হলো, যখন আমি তলিয়ে যাচ্ছি, সেই সময় হঠাৎ করেই আমার মনে হলো, এই যে তলিয়ে যাচ্ছি, হয়তো বা আমি আর এখান থেকে উঠে আসতে পারব না। তখন আরেকবার খুব কাছ থেকে মৃত্যুকে দেখলাম। বারবার মৃত্যুকে খুব কাছ থেকে দেখার পর স্বাভাবিকভাবেই মৃত্যুচিন্তাটি মাথায় আসে। আমার মধ্যে যেটা হয়, আমি নেই অথচ সব কিছু আগের মতোই আছে—এই বোধটা আমাকে খুব কঠিনভাবে আক্রমণ করে। বেশির ভাগ মানুষকেই আমি দেখেছি, তাঁরা খুব সহজভাবে মৃত্যুকে নেন এবং বলেন, আমি নেই তো কী হয়েছে, আমার ছেলেমেয়েরা আছে, আত্মীয়স্বজন আছে, পরবর্তী প্রজন্ম আছে। আমি থাকব না, তারা তো থাকবে। এভাবেই অনেকে বিষয়টি সহজভাবে নিতে পারেন। আমি কেন জানি নিতে পারি না। আমার কাছে আমি থাকাটাই খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়।

ইমদাদুল হক মিলন : বড় লেখকদের ক্ষেত্রে কালজয়ী শব্দটা বাংলা ভাষায় আছে। যাঁরা সময়কে জয় করে নেন নিজের লেখার মধ্য দিয়ে। আপনি আপনার লেখার মধ্য দিয়ে বেঁচে থাকবেন, এই ফিলিংসটা আপনার কেমন ?

হুমায়ূন আহমেদ : এই বিষয়টা একেবারেই আমার মাথায় আসে না। আমিই নেই আর আমার লেখা লোকজন পাঠ করছে, এতে আমার কী যায় আসে ?

ইমদাদুল হক মিলন : কিন্তু এ রকম কি কখনো মনে হয় না, আমার যে লেখাগুলো আমি রেখে যাচ্ছি, তার মধ্যেই আমি বেঁচে থাকব, লোকজন আমাকে স্মরণ করবে ?

হুমায়ূন আহমেদ : না, সে রকম মনে হয় না। মিলন, আমি তোমাকে সিরিয়াসলি বলছি, আই অ্যাম টেলিং ইউ ফ্রম মাই হার্ট...এই চিন্তাটা কখনো আমার হয় না যে ৫০ বছর পর লোকে আমার লেখা পড়বে, আমি কত ভাগ্যবান! আমি সারা জীবন লেখালেখি করেছি নিজের আনন্দের জন্য।

১১

ইমদাদুল হক মিলন : আপনি বললেন যে বেশ কয়েকবার মৃত্যু খুব কাছ থেকে দেখেছেন। যখন আপনার বাইপাস সার্জারিটা হলো, যখন আপনাকে অ্যানেসথেশিয়া দেওয়া হচ্ছে, আপনার সেন্সটা অন্য জগতে চলে যাচ্ছে। গভীর ঘুমের জগতে চলে গেছেন। সেই ঘুমের মধ্যেই আপনার শরীর কেটেকুটে আপনার হৃদয় জোড়া দিয়ে দিচ্ছেন ডাক্তাররা। এই যে ঘুমে তলিয়ে যাওয়ার সময়টা, যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার চেতনা ছিল, সেই মুহূর্তে আপনি বিশেষ কিছু কি ভেবেছেন ? আপনার মনে পড়ে ?

হুমায়ূন আহমেদ : আমি তো মুসলমানের ছেলে। ধর্মবিশ্বাসটা জন্মের পর থেকেই খুব শক্তভাবে মাথায় ঢোকানো। সেই মুহূর্তে আমি যে কয়টা সূরা জানতাম, বারবার সেগুলোই মনে মনে পড়ার চেষ্টা করেছি এবং সূরা পাঠের সঙ্গে সঙ্গে বেঁচে যাওয়ার প্রার্থনা করছিলাম। পুত্র-কন্যা-স্ত্রী-ভাই-বোন—এদের কারও কথাই মনে হয় নি।

ইমদাদুল হক মিলন : তার মানে আপনি তীব্রভাবে একজন ধর্মবিশ্বাসী মানুষ!

হুমায়ূন আহমেদ : অবিশ্বাসী লোক যারা আছে, তারাও মরণ যখন সামনে এসে দাঁড়ায় আর সে যদি মুসলমান হয়, তাহলে আল্লাহকেই প্রথমে ডাকে। সে যদি খ্রিষ্টান হয় তাহলে সে জেসাসের কাছে প্রার্থনাটি জানায়। হিন্দু হলে ভগবানকে ডাকে। প্রচণ্ড আতঙ্ক এবং অনিশ্চিত একটা সময়ে মানুষের তো আর কোথাও যাওয়ার জায়গা থাকে না। সৃষ্টিকর্তাকে আশ্রয় মনে করে। তবে আমি আসলে ধর্মবিশ্বাসী মানুষ, আমি সংশয়বাদী মানুষ না। অনেক কিছু নিয়েই আমি সংশয়ে থাকি। তার পরও মনে করি, এই যে জটিল পৃথিবী তৈরি করা এবং সেখানে মানুষের মতো অতি জটিল একটি বুদ্ধিমান প্রাণীর সৃষ্টি হওয়া, এটা মোটেই কাকতালীয় ঘটনা হতে পারে না। এখানে একটা ডিভাইন কমান্ড লাগে।

ইমদাদুল হক মিলন : আপনি বিজ্ঞানের মানুষ, একজন বিজ্ঞানসচেতন মানুষ। বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকেও কি কোনো রকম ব্যাখ্যা করা যায় না ?

হুমায়ূন আহমেদ : প্রকৃতিকে বোঝার জন্যই বিজ্ঞান। একটি পর্যায়ে এসে বিজ্ঞান কিন্তু থমকে যায়। বিগ ব্যাং থেকে সৃষ্টির শুরু। বিগ ব্যাংয়ের আগে কী ?

অণু-পরমাণুর ধাক্কাধাক্কিতে জটিল অণু তৈরি হলো। সেই অণু থেকে প্রাণের উদ্ভব। প্রাণের একটি ধারায় এসে আমরা পেলাম মানুষ, অন্য একটি ধারায় গোলাপ ফুলের মতো সৌন্দর্য, যে সৌন্দর্য মানুষকে মোহিত করছে। পুরো ব্যাপারটা শুধু অণু-পরমাণুর ধাক্কাধাক্কিতে হয়ে যাচ্ছে—এটা বিশ্বাস করা কঠিন।

ইমদাদুল হক মিলন : আপনি কি মনে করেন মানুষ যদি তীব্রভাবে ধর্মে বিশ্বাসী হয়, তাহলে সমাজ, দেশ আর মানুষের জীবনটা বদলে যেতে পারে ?

হুমায়ূন আহমেদ : ধর্ম সব সময় কল্যাণের কথাই বলে। ধর্মের অনুভূতিও মানুষকে কল্যাণ আর মঙ্গলের দিকেই টেনে আনে। ধর্ম কখনোই মানুষকে খারাপ কাজ করতে বলে না। একটা সময় পৃথিবীতে সভ্যতা বলতে কিছুই ছিল না। কোনো আইনকানুন কিছুই ছিল না। সেই সময় ছিল কেবল ধর্ম। ধর্মই মানুষকে ভালো হওয়ার কথা বলেছে, ভালো থাকার কথা বলেছে। ধর্মই ছিল শেষকথা। ধর্মের ভয়, সেটাই ছিল একমাত্র আমাদের আইন-আদালত। এখন তো আইনকানুন হয়েছে, আদালত হয়েছে। পাশাপাশি ধর্মও আছে। ধর্মের অনেক বিধান এখন আমাদের কাছে মনে হচ্ছে, সেই সময় যেটা ছিল, এই সময় সেটা ঠিক না। যেমন—চুরি করলে হাতটা কেটে দেওয়া। সেটা হয়তো সেই সময়ের জন্য খুবই প্রয়োজনীয় ছিল। আমি মনে করি না, এই সময়ের জন্য সেটা ঠিক আছে। আরবে একবার দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। দুর্ভিক্ষের সময় হজরত ওমর (রা.) হাত কাটার সেই বিধান বা আদেশ রদ করেছিলেন। কারণ দুর্ভিক্ষের সময় মানুষকে তো বাঁচতে হবে। কাজেই হাত কাটা বিষয়টি তিনি বাতিল করেছিলেন। সুতরাং তিনি তো সেটা করে গিয়েছিলেন। আজকে হাত কাটার বিধান বন্ধ করে দেওয়া হলে সমস্যা কোথায়!

ইমদাদুল হক মিলন : ইসলাম ধর্মের একটি বিষয়ের প্রতি আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করছি। নারীর অধিকার বা মর্যাদার প্রতি ইসলাম যথেষ্ট সহানুভূতিশীল। তার পরও কিন্তু আমরা প্রায়ই শুনতে পাই ধর্মের দোহাই দিয়ে নানা রকম নারী নির্যাতনের কথা, বিশেষ করে আমাদের মতো দরিদ্র দেশগুলোতে। এর পেছনের কারণটা কী বলে আপনার মনে হয় ? যেমন—একটা মেয়েকে দ্বিতীয় বিয়ে করার অপরাধে মাটির গর্তে পুঁতে ১০১টা পাথর ছুড়ে মারা হয়েছিল। সেই মেয়েটি অপমান-অভিমানে পরে আত্মহত্যা করে। ধর্মের নামে এই যে অনাচারগুলো চলছে, এই ব্যাপারগুলো আপনি কীভাবে দেখছেন ?

হুমায়ূন আহমেদ : ধর্ম মানুষকে অপমান করতে আসে নি। অপমান থেকে উদ্ধার করতেই ধর্ম এসেছে। শোনো, নেপালে একটা মন্দির আছে, যে মন্দিরে হিন্দু ছাড়া অন্য ধর্মের মানুষের প্রবেশ নিষেধ। মন্দিরটা দেখার আমার বড় শখ হলো। মন্দিরের লোকরা বলল, এই মন্দিরে মুসলমান বা অন্য ধর্মের মানুষের প্রবেশ নিষিদ্ধ। মন্দিরের বাইরের অংশটুকু আমি ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম। একজন আমাকে বলল, 'ওই যে পুরোহিত সাহেব। তিনি আপনাদের এখানে দেখলে রাগ করবেন, আপনারা চলে যান।' আমি পুরোহিত সাহেবের কাছে গিয়ে বললাম, 'ভাই, আমি বাইরে থেকে

দেখতে পাচ্ছি আপনাদের মন্দিরের আঙিনায় অনেক কুকুর ঘোরাঘুরি করছে। আমরা কি কুকুরের চেয়ে খারাপ যে কুকুর ভেতরে যেতে পারবে আর আমরা পারব না!' তিনি আমার প্রশ্নের জবাব দিতে পারেন নি।

ইমদাদুল হক মিলন : এবার আমরা অন্য প্রসঙ্গে যাব। আপনার রাজনৈতিক বিশ্বাস আসলে কী ? আপনি বিএনপিও না, আওয়ামী লীগও না, কোনো দলেরও লোক না এবং কখনোই সে রকম কিছু ছিলেন না। তার পরও একজন সচেতন মানুষ হিসেবে, একজন বড় লেখক হিসেবে আপনি তো একটা দেশের রাজনৈতিক চেহারা দেখেন; যে রাজনৈতিক চেহারার ফলে মানুষ সুখে থাকবে এবং রাষ্ট্র এগিয়ে যাবে। এ ধরনের কোনো আদর্শ বা বিশ্বাস আপনার আছে কি না জানতে চাইছি।

হুমায়ূন আহমেদ : ক্ষুধার্ত দেশের আবার রাজনীতি কী ? আমাদের মতো দেশের প্রধান রাজনীতি হওয়া উচিত ক্ষুধা সম্পূর্ণ দূর করা। যে শিশুগুলো জন্মগ্রহণ করেছে, তাদের প্রত্যেকের খাবারের অধিকার, কাপড়ের অধিকার, বাসস্থানের অধিকার, চিকিৎসার অধিকার ও পড়াশোনার অধিকার আগে নিশ্চিত করতে হবে; তারপর রাজনীতি।

ইমদাদুল হক মিলন : আপনি 'প্রার্থনা দিবস' নামে একটি লেখা লিখেছেন, যে লেখাটি ব্যাপক আলোচিত। আপনি হজরত শাহ্‌জালাল (রহ.)-এর মাজারে গিয়ে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছেন, যেন আমাদের দেশের দুই নেত্রীর মধ্যে মিলমিশ হয় এবং তাঁরা যেন একত্রে দেশ পরিচালনায় অংশগ্রহণ করেন। এই বিষয়টি ঠিক কী উদ্দেশ্যে আপনি লিখলেন ?

হুমায়ূন আহমেদ : আমি দেখি আমাদের দুই নেত্রী কিছুতেই কোনো বিষয়ে একমত হতে পারছেন না, এমনকি ভালো কিছুতেও না। কেউ একজন কোনো ভালো কাজ করলে অন্যজন তাঁকে অ্যাপ্রিশিয়েট করছেন না, সেই ভালোটার পেছনে মন্দ খুঁজছেন। আর কেউ যদি ভুল কাজ করেন, সেটা তো বলাই বাহুল্য। একজন দেশ চালান পাঁচ বছর ধরে। এই পাঁচ বছরে নিশ্চয়ই তিনি কিছু না কিছু ভালো কাজ করেন। কোনো ভালো কাজই বিরোধী দলে যিনি থাকেন, তিনি অ্যাপ্রিশিয়েট করেন না। আবার তিনি যখন ক্ষমতায় এসে ভালো কাজ করেন, ক্ষমতার বাইরে গিয়ে অন্যজন স্বীকার করেন না। অত্যন্ত দুঃখজনক অবস্থা। সংসদে যখন তাঁরা কথাবার্তা বলেন, তখন দুই পক্ষকে দেখে মনে হয়, তাঁরা যেন দুই চিরশত্রু। শেখ হাসিনা অনেক কঠিন কথাবার্তা বলেন, হয়তো ঝোঁকের মাথায় বলে ফেলেন। যে কথাগুলো তিনি যখন দেশের একজন প্রধানমন্ত্রী, তাঁর মুখ থেকে শুনতে আমার নিজের ভালো লাগে নি। যখন তাঁরা ক্ষমতায় থাকেন, তখন তাঁরা বলেন, আমি যখন বিরোধী দলে যাব তখন আর হরতাল ডাকব না। কিন্তু যে মুহূর্তে তাঁরা বিরোধী দলে আসেন, আগের কথাগুলো একেবারেই ভুলে যান। হরতাল দিতে তাঁদের কোনো সমস্যা থাকে না। প্রতিটি রাজনৈতিক দলের একটি করে ছাত্রসংগঠন আছে। এটা আমার কাছে বিস্ময়কর মনে হয়। ছাত্ররা পড়াশোনা করবে, তাদের আবার কিসের রাজনীতি ? আমরা যখন পরাধীন ছিলাম,

তখন হয়তো ছাত্রদের রাজনীতি করার প্রয়োজন ছিল। এখন তো আমরা পরাধীন না। এখন ছাত্ররা করবে পড়াশোনা। অথচ তাদের ঠেলে দেওয়া হচ্ছে রাজনীতির নামে হানাহানির দিকে। আর ছাত্রদের শিক্ষক যাঁরা, তাঁরা কী করছেন? তাঁরা লাল দল, নীল দল, সাদা দল, হলুদ দলে বিভক্ত। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা যদি রাজনীতি করতে পারেন, উকিলরা যদি রাজনীতি করতে পারেন, ডাক্তাররা যদি রাজনীতি করতে পারেন, তাহলে আমাদের মিলিটারিদের রাজনীতি করতে সমস্যা কোথায়? পুলিশবাহিনীর রাজনীতি করতে সমস্যা কোথায়? সেনাবাহিনীর একদল বিএনপি হয়ে যাবে, অন্য দল আওয়ামী লীগ হয়ে যাবে। একটা দেশে কিছু লোক রাজনীতি করার সুযোগ পাবে, কিছু লোক পাবে না—এটা তো হতে পারে না। এসব ব্যাপার নিয়ে মাথার মধ্যে আমার মাঝেমধ্যে জট পাকিয়ে যায়, যাকে বলে ব্রেন কলাপস। এই ব্রেনের কলাপস দূর করার জন্য প্রার্থনা দিবসের কথাগুলো বলেছি। বলার পরপরই পেয়েছি অনেক রকম প্রতিক্রিয়া। একদল লোক আছে সংশয়বাদী, তারা কোনো প্রার্থনাই বিশ্বাস করে না। তাদের যুক্তি হচ্ছে, প্রতিবছরই তো আমাদের এখানে বিশ্ব ইজতেমা হয়, বিশাল প্রার্থনা হয়। সেই প্রার্থনার ফল কী? এসব প্রার্থনার কোনো ফল নেই। লাখ লাখ লোক প্রার্থনা করছে অথচ তার কোনো ফল নেই। এসব প্রার্থনায় কোনো কাজ হবে না। এটা হচ্ছে তাদের যুক্তি। আরেক দলের যুক্তি হচ্ছে, আপনি হুমায়ূন আহমেদ...প্রার্থনা দিবসের ডাক দেওয়ার কোনো যোগ্যতা আপনার নিজের নেই। আপনার নিজের জীবনটা তো প্রার্থনা করে আপনি ঠিক করতে পারেন নি। যখন প্রার্থনা করে আপনি নিজের জীবনটাই ঠিক করতে পারলেন না, তখন দেশ নিয়ে প্রার্থনা করার যোগ্যতা আপনার কোথায়? আমার যুক্তি হচ্ছে, প্রার্থনা ব্যাপারটি সম্পূর্ণ প্রতীকী ব্যাপার। একজন শুদ্ধ মানুষ যেমন তাঁর দেশের জন্য প্রার্থনা করতে পারেন, তেমনি একজন অশুদ্ধ মানুষও প্রার্থনা করতে পারেন দেশের জন্য। আসল কথা হলো দেশের জন্য প্রার্থনা করা। এই প্রার্থনার ডাকটি যখন অন্য কেউ দেয় নি, তখন এই দেশের একজন মানুষ হিসেবে, একজন লেখক হিসেবে আমি মনে করেছি এই ডাকটি আমার দেওয়া উচিত। দেশের মানুষ প্রার্থনার ডাকে সাড়া দেবে কি দেবে না, এটা তাদের ব্যাপার। আমার প্রার্থনা আমি করি না কেন? আমার বিশ্বাস আমি জানালাম। 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে'।

ইমদাদুল হক মিলন : কিছুক্ষণ আগে আপনি একটা খুবই যুক্তিসংগত কথা বলেছেন। প্রতিটি রাজনৈতিক সংগঠনের একটি করে ছাত্রসংগঠন আছে, আইনজীবী সংগঠন আছে, ডাক্তার সংগঠন আছে। কেবল সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী, আর্মি আর পুলিশ বাদে প্রায় সবাই এখন রাজনীতি করছেন। ছাত্ররাজনীতি, শিক্ষক রাজনীতি বা অন্য পেশাজীবীদের রাজনীতি করার কথা বলার সময় আমি আপনার ভেতর তীব্র ক্ষোভ লক্ষ করেছি। এ বিষয়টি একটু ব্যাখ্যা করবেন কি?

হুমায়ূন আহমেদ : ছাত্রদের একটাই কাজ—পড়াশোনা। রাজনীতি হচ্ছে একটা ফুলটাইম ওয়ার্ক। ছাত্ররা যখন পড়াশোনা শেষ করবে, তারপর তারা রাজনীতির

প্রফেশনে আসবে। শিক্ষকদের কাজ হচ্ছে ছাত্র পড়ানো। এই ছাত্র পড়ানোর সঙ্গে রাজনীতির কোনো সম্পর্কই নেই। কেমিস্ট্রির মধ্যে কোনো বিএনপি কেমিস্ট্রি নেই, কোনো আওয়ামী লীগ কেমিস্ট্রি নেই। কেমিস্ট্রি হচ্ছে কেমিস্ট্রি, কেমিস্ট্রি পড়ানোর জন্য একজন শিক্ষককে আওয়ামী লীগও হতে হয় না, বিএনপিও হতে হয় না। তিনি যদি কোনো দলকে সমর্থন করেন, সেটা তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। এই ব্যক্তিগত ব্যাপারটি কখনোই প্রকাশ্য হওয়া উচিত নয়।

ইমদাদুল হক মিলন : এর আগে অন্য একটি প্রসঙ্গে আপনি অল্প কিছু কথা বলেছেন। বিষয়টি হলো হরতাল। আমি জানি, হরতালের ব্যাপারে আপনার ভিন্ন মত আছে এবং আপনি একজন হরতালবিরোধী মানুষ। আমাদের মতো দেশে হরতাল করার যৌক্তিকতা কতটুকু ?

হুমায়ূন আহমেদ : একটা হতদরিদ্র দেশ, যেখানে বেশির ভাগ মানুষের ক্ষুধার বিরুদ্ধে লড়াই করতে হচ্ছে, এই দেশে সামান্য কারণে একটা হরতাল দিয়ে দেব, সারা দেশটা অচল করে দেব—এই যে ক্ষতিটা, এটা কার ক্ষতি ? এটা কি আমার নিজের দেশের ক্ষতি না ? আমরা নিজেরাই কেন নিজেদের ক্ষতি করব ? যেসব রাজনীতিবিদ হরতাল দিচ্ছেন, তাঁরা যদি একটা ঘোষণা দেন যে আমরা হরতাল দিচ্ছি, তবে এই হরতাল পালন করা না করা সম্পূর্ণ জনগণের ইচ্ছার ওপর। আমরা কোনো গাড়িতে বোমা মারব না, মানুষকে জোর করব না, ধাক্কাধাক্কি বা মারামারি করব না। দেখো, এবার হরতাল বলে কিছু হয় কি না। একটা সময় হরতাল হতো স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল। এরশাদকে নামাতে হবে, নইলে দেশের ক্ষতি হবে, আর এ জন্য হরতাল। পুরো দেশ নিজ থেকেই অচল হয়ে যেত। সেই সময় এখন আর নেই। জোর করে ঘাড় ধরে হরতাল। এর কোনো মানে আছে এখন ?

ইমদাদুল হক মিলন : একাত্তর-পূর্ববর্তী হরতালও ছিল সে রকম। উনসত্তর বা সত্তরের সময়ও স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল হয়েছে।

হুমায়ূন আহমেদ : ছেলেমেয়েরা এসএসসি পরীক্ষা দিচ্ছে। কত রকম সমস্যা কাটিয়ে প্রস্তুতি নিয়েছে। এই সময় একটা হরতাল যদি পড়ে যায়, তাহলে এই ছেলেটি কোথায় যাবে ? রাজনীতির ওপর তার কি ভরসা থাকে ? এই ভুলগুলো কি আমাদের রাজনীতিবিদরা করছেন না ? তাঁরা এই ভুলগুলো করছেন সম্পূর্ণ নিজের স্বার্থে। তাঁরা দেশের কথা ভাবলে, মানুষের কথা ভাবলে কিছুতেই হরতাল দিতে পারেন না।

ইমদাদুল হক মিলন : এই হরতালের কালচারটা তো যখন যেই দল ক্ষমতার বাইরে আসছে, তখনই হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে।

হুমায়ূন আহমেদ : ব্যবহার নয়, একে বলে অপব্যবহার। আমার যদি ক্ষমতা থাকত, তাহলে আমি আইন পাস করতাম—এই দেশে কেউ হরতাল করতে পারবে না। এই দেশের ছাত্ররা রাজনীতি করতে পারবে না। শিক্ষক, ডাক্তার, আইনজীবীরাও রাজনীতি করতে পারবেন না। ক্ষমতা থাকলে অবশ্যই এ ধরনের আইন করতাম। যাঁরা এ ধরনের আইন করার উদ্যোগ নেবেন, তাঁদের প্রতি আমার পূর্ণ সমর্থন থাকবে।

ইমদাদুল হক মিলন : যাঁরা ক্ষমতায় আসছেন, আবার ক্ষমতার বাইরে যাচ্ছেন, পালাক্রমে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব নিচ্ছেন; তাঁরা কি ভাবেন না হরতাল নিষিদ্ধ করে আইন করার কথা কিংবা ছাত্র ও শিক্ষকদের রাজনীতি বন্ধ করার কথা ?

হুমায়ূন আহমেদ : আমি জানি না। হয়তো তাঁদের মাথার ভেতর এসব নিয়ে অন্য রকম যুক্তি আছে। যাঁরা ক্ষমতায় যাচ্ছেন তাঁরা হয়তো ভাবছেন, আজকে যদি আমি হরতাল নিষিদ্ধ করে আইন করি, তারপর যখন বিরোধী দলে যাব, তখন কী হবে ? তখন তো আন্দোলন জমানোর জন্য আমাকে হরতাল দিতে হবে। সম্ভবত এই চিন্তা থেকেই আওয়ামী লীগ ও বিএনপি উভয় দল পালাক্রমে ক্ষমতায় গেলেও কেউই হরতাল নিষিদ্ধ করে আইন করছে না। হয়তো-বা তাদের চিন্তা আরও বেশি পরশীলিত। হয়তো তারা মনে করে, আমাদের দেশে হরতালের প্রয়োজন আছে। কিন্তু আমি মনে করতে পারছি না। হরতালের পক্ষে রাজনীতিবিদদের নিশ্চয়ই যুক্তি আছে। তুমি হরতাল নিয়ে শেখ হাসিনার ইন্টারভিউ নাও, বিরোধী দলের নেত্রী খালেদা জিয়ার ইন্টারভিউ নাও। তুমি তাঁদের মতামত নাও। তুমি তাঁদের অ্যাপ্রোচ করতে পারো যে আমাদের এই দেশের মানুষজন সরাসরি আপনাদের মুখ থেকে কিছু কথা শুনতে চায়। আপনারা কি আমাকে ইন্টারভিউ দেবেন ? তাঁরা যদি 'টাইম' পত্রিকায় ইন্টারভিউ দিতে পারেন, তাঁরা যদি আমেরিকান চ্যানেলে ইন্টারভিউ দিতে পারেন, তাহলে আমাদের দেশের একজন লেখককে ইন্টারভিউ দেবেন না কেন ? তাঁদের বলো, আমি এই দেশের মানুষ, আমি এই দেশের লেখক, আমি এই দেশের মানুষের কথা লিখি। আমি এই দেশের মানুষের পক্ষ থেকে আপনাদের ইন্টারভিউ নিতে চাই।

ইমদাদুল হক মিলন : হুমায়ূন ভাই, বাংলাদেশ নিয়ে আপনি কী ধরনের স্বপ্ন দেখছেন ? এই দেশের স্বাধীনতার জন্য মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল, সেই মুক্তিযুদ্ধে আপনার বাবা প্রাণ দিয়েছেন। বহু উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে এই দেশের আজকের প্রেক্ষাপটে আপনি একজন বড় লেখক। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আপনি বাংলাদেশ নিয়ে কী স্বপ্ন দেখছেন ?

হুমায়ূন আহমেদ : আমি আমার নিজের দেশ নিয়ে অসম্ভব রকম আশাবাদী। আমাকে যদি এক লাখ বার জন্মানোর সুযোগ দেওয়া হয়, আমি এক লাখ বার এই দেশেই জন্মাতে চাইব। এই দেশের বৃষ্টিতে ভিজতে চাইব। এই দেশের বাঁশবাগানের জোছনা দেখতে চাইব।

হুমায়ূন আহমেদের কলকাতার লেখকবন্ধুরা

হুমায়ূন আহমেদ কলকাতার এক হোটেলে উঠেছেন।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় খবর পেয়েছেন। হোটেলে ফোন করে হুমায়ূন ভাইকে বলেছেন, দেখা করতে আসবেন।

হুমায়ূন ভাই সেদিন দুপুরের পরই সময় দিয়েছেন।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা সম্পর্কে হুমায়ূন ভাইয়ের তেমন ধারণা ছিল না। পরে ঢাকায়, তাঁর দখিন হাওয়ার ফ্ল্যাটের আড্ডায় ঘটনাটি বলতে বলতে হঠাৎই আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের দু-চারটা লেখার কথা বলো তো?

আমি শ্যামলদার লেখার ভক্ত। ঢাকা কলকাতায় অনেকবার তাঁর সঙ্গে আড্ডা হয়েছে। আমি তাঁর কিছু অসাধারণ লেখার কথা বললাম, 'কুবেরের বিষয় আশয়' 'ঈশ্বরীতলার রুপোকথা' 'স্বর্গের আগের স্টেশান' 'হাওয়া গাড়ি' 'শাহজাদা দারশুকো' এইসব উপন্যাস আর দুতিনটি গল্পের কথা বললাম। যেমন 'চন্দশ্বেসরের মাচান তলায়' 'পরী' 'গত জন্মের রাস্তা'। আর তাঁর বাংলাসাহিত্যে একেবারেই নতুন ধরনের গদ্যভাষার কথাও বললাম।

হুমায়ূন ভাই শুনলেন তারপর ঘটনাটা বললেন।

হুমায়ূন আহমেদ যে অসাধারণ জাদুকরী ভঙ্গিতে লিখতেন, গল্পও করতনে ঠিক সেই ভঙ্গিতে। তিনি কথা বলবার সময় আমরা মুগ্ধ বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে থাকতাম। সেই সন্ধ্যায়ও আছি। তো শ্যামলদা দুপুরের পর পর হুমায়ূন ভাইয়ের হোটেলে এলেন। রুমে বসে চা খেতে খেতে গল্প হচ্ছে দুই লেখকের। শ্যামলদাকে যাঁরা চেনেন যাঁরা তাঁর লেখা পড়েছেন তাঁরা জানেন, তাঁর রসোবোধ চমৎকার। আর হুমায়ূন আহমেদের রসোবোধের তুলনাই হয় না।

কথায় কথায় শ্যামলদা একসময় বললেন, আমার দাঁতগুলো দেখেছেন হুমায়ূন? কী চকচক করছে! আসলে ফলস দাঁত লাগিয়েছি। এই দাঁতের মুশকিল হলো একটাই, চুমু খেতে অসুবিধা!

হুমায়ূন ভাই সিগ্রেট টানতে টানতে নির্বিকার গলায় বললেন, দাঁত খুলে নেবেন। নিজের খুলতে অসুবিধা হলে প্রেমিকাকে বলবেন মাঝারি সাইজের একটা চড় মারতে, দাঁত আপনা আপনি খুলে বেরিয়ে আসবে।

হুমায়ূন আহমেদের রসোবোধে শ্যামলদা মুগ্ধ।

তারপর হুমায়ূন ভাই তাঁর অতি বিনয়ী ভঙ্গিতে, হাসিমুখে বললেন, আপনি একবার সন্তোষকুমার ঘোষকে চড় মেরেছিলেন। চড় খেয়ে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র চাকরি ছাড়লেন। আমি সেই স্মৃতি মনে রেখে চড়ের কথাটা বললাম। কিছু মনে করবেন না।

কলকাতার লেখকদের মধ্যে হুমায়ূন ভাইর প্রথম যোগাযোগ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে। '৭০ সালে প্রকাশিত হয়েছিল হুমায়ূন ভাইর প্রথম উপন্যাস 'নন্দিত নরকে'। স্বাধীনতার পর '৭২ সালের শুরুর দিকে সেই উপন্যাসের একটি কপি কেমন কেমন করে গিয়ে পড়ল সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের হাতে। 'নন্দিত নরকে' তখন আমাদের লেখক বুদ্ধিজীবী মহলে ব্যাপক আলোচিত। বইয়ের ভূমিকা স্বপ্রণোদিত হয়ে লিখেছেন মনীষী আহমদ শরীফ। শওকত আলী প্রমুখ লেখকরা বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় আলোচনা লিখছেন। বাংলাসাহিত্যে একেবারে নতুন স্বাদ নিয়ে এসেছেন হুমায়ূন আহমেদ। অতি সাদামাটা সরল ভাষায় মধ্যবিত্ত জীবনের সুখ দুঃখ আনন্দ বেদনার গল্প এর আগে এভাবে কোনো লেখক লিখতে পারেন নি।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তখন 'দেশ' সাপ্তাহিকে 'সনাতন পাঠক' নামে বইপত্রের আলোচনা এবং লেখক বিষয়ক নানারকম খুটিনাটি বিষয় নিয়ে কলাম লেখেন। অন্যদিকে 'কৃত্তিবাস' বের করেন বন্ধুদের নিয়ে।

'নন্দিত নরকে' নিয়ে তিনি একটি লেখা লিখলেন। তাঁর সেই লেখার মধ্য দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের পাঠক জানতে পারলেন বাংলাদেশের এক তরুণ তুখোড় ঔপন্যাসিকের কথা, কালক্রমে যিনি কিংবদন্তি হয়ে উঠলেন।

হুমায়ূন ভাই বোধহয় তারপরই সুনীলদাকে চিঠি লিখেছিলেন। পত্র যোগাযোগ তাঁদের মধ্যে ছিল। ধীরে ধীরে সেই যোগাযোগ গভীর হলো। সুনীলদা ঢাকায় এলেই হুমায়ূন ভাইর ফ্ল্যাটে আসেন। সাহিত্যের আড্ডা আর গানে, আমাদের তুমুল হৈ-হল্লায় সময় কাটে। কখনো কখনো স্বাতীদিও (স্বাতী গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের স্ত্রী) থাকেন।

একবার পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশের লেখকদের নিয়ে একটা সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে কলকাতায়। বাংলাদেশ থেকে সেমিনারে আমন্ত্রিত হয়ে গেছেন আখতারুজ্জামান ইলিয়াস এবং হুমায়ূন আহমেদ। অনুষ্ঠানের সভাপতি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস তাঁর লেখার মতোই অতি সিরিয়াস একটা বক্তৃতা দিলেন। প্রেমের গল্প উপন্যাস যাঁরা লেখেন, হালকা চালের পাঠকমন জয় করা যাঁরা লেখক তাঁদেরকে খুব একচোট নিলেন। আকার ইঙ্গিতে হুমায়ূন আহমেদকেও একটু ধরলেন, একটু তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করলেন।

হুমায়ূন আহমেদের মতো বুদ্ধিদীপ্ত মানুষ আমি জীবনে দেখি নি। তিনি মুহূর্তেই বুঝলেন ব্যাপারটা। লজ্জা পেলেন, মাথা নিচু করে বসে রইলেন। সুনীলদা ব্যাপারটা খেয়াল করলেন। সভাপতির বক্তব্য দিতে উঠে তিনি আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের বক্তব্য বিভিন্ন যুক্তিতে খণ্ডন করলেন, প্রেমের গল্প কবিতা উপন্যাস নিয়ে এমন কিছু কথা বললেন, পৃথিবীর বিখ্যাত সব লেখকের প্রেম বিষয়ক লেখার উদ্ধৃতি দিলেন,

হুমায়ূন ভাইয়ের মন ভালো হয়ে গেল। আর কে না জানে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো পাঠক বাঙালি লেখকদের মধ্যে বিরল। সারা পৃথিবীর সাহিত্য তিনি ভেজে খেঁয়েছেন।

তারপর আরেকটা কাজ করলেন সুনীলদা।

তখন হুমায়ূন ভাইকে তিনি আপনি করে বলতেন। অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর বললেন, হুমায়ূন, আমাদের একটা আড্ডাখানা আছে, নাম 'বুধসন্ধ্যা'। প্রতি বুধবার সন্ধ্যায় আমরা ওখানটায় বসে আড্ডা দিই, গান গল্প করি। কবিতা গল্প পড়ি। কাল 'বুধসন্ধ্যা'র একটা গল্প পাঠের আসর আছে। আপনি গল্প পড়বেন।

পরদিন 'বুধসন্ধ্যা'য় গল্প পড়লেন হুমায়ূন ভাই। গল্পের নাম 'আনন্দ বেদনার কাব্য'। পড়া শুরু করার কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই স্তব্ধ হয়ে গেল হলরুম। একটা সময়ে দেখা গেল শ্রোতারা অনেকেই চোখ মুচছেন।

হুমায়ূন আহমেদ ছিলেন এ রকম জাদুকর। লিখে মানুষ কাঁদাতে আর হাসাতে তাঁর তুলনা তিনি নিজে।

কলকাতার দুজন লেখকের খুব প্রিয় জায়গা ঢাকা। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সমরেশ মজুমদার। ঢাকায় এলে হুমায়ূন ভাইর ফ্ল্যাটে তাঁরা আসবেনই, নুহাশপল্লীতে গিয়ে একটা রাত হলেও থাকবেন। দুজনেই এত ভালোবাসেন হুমায়ূন আহমেদকে, লেখক হিসেবে এত শ্রদ্ধা করেন, ভাবা যায় না। বড় লেখকের পাশাপাশি এই দুজন মানুষ হিসেবেও বড়, হুমায়ূন আহমেদের মতোই। হুমায়ূন ভাই লেখক হিসেবে যে মাপের, মানুষ হিসেবেও সেই মাপেরই। তাঁর হৃদয় ছিল শরীরের তুলনায় কোটিগুণ বড়।

আরেকজন বড় লেখক হুমায়ূন আহমেদের লেখা এবং ব্যক্তি হুমায়ূনকে খুবই ভালোবাসেন। তিনি শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়। হুমায়ূন ভাই শীর্ষেন্দুর লেখা যেমন পছন্দ করতেন, মানুষটিকেও পছন্দ করতেন। ঢাকায় এলে হুমায়ূন ভাইর সঙ্গে দেখা শীর্ষেন্দুদা করতেনই। এক দু'ঘণ্টা গল্প করতেন। ঐশ্বরিক জগতের গল্প, ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের গল্প।

শীর্ষেন্দুদার জীবনযাপন অন্যরকম। এক ধরনের স্বাত্ত্বিক জীবনযাপন করেন তিনি। লেখেন অসাধারণ। এখনো মন্ত্রমুগ্ধের মতো আমরা তাঁর লেখা পড়ি।

হুমায়ূন ভাই বেশি পছন্দ করতেন শীর্ষেন্দুদার কিশোরদের লেখাগুলো। ঢাকার বহু অনুষ্ঠানে শীর্ষেন্দুদার বক্তৃতা শুনেছি আমি। সেইসব বক্তৃতায় হুমায়ূন আহমেদের লেখার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতেন তিনি।

এবার সমরেশ মজুমদারের কথা বলি।

নব্বই দশকের শুরুর দিকে প্রথম ঢাকায় এলেন সমরেশদা। ততদিনে তিনি বাংলাভাষার জনপ্রিয়তম লেখকদের একজন। *উত্তরাধিকার, কালবেলা, কালপুরুষ* এই ট্রিলজি জনপ্রিয়তার আগের অনেক রেকর্ড ভেঙে ফেলেছে। আমরা আবিষ্ট হয়ে আছি সেই ট্রিলজির মায়ায়। তারপর তিনি লিখলেন দুই পর্বের *সাতকাহন*। এই উপন্যাস আরও একধাপ এগিয়ে নিল তাঁকে। তার আগে সমরেশদার প্রথম উপন্যাস

দৌড়, এই আমি রেণু আর *দেশ* পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর দুর্দান্ত একেকটা গল্প পড়ে পাঠক মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে আছে।

সমরেশদা ঢাকায় এলেন পার্ল পাবলিকেশন্সের স্বত্বাধিকারী আলতাফ হোসেনের আমন্ত্রণে। আলতাফ সাহেবের ডাকনাম 'মিনু'। আমরা ডাকতাম মিনুভাই। অতি বড় হৃদয়ের অসাধারণ মানুষ।

আহা, কত ভালো ভালো মানুষ আমাদেরকে ছেড়ে চলে গেছেন। মিনুভাইও অকালে চলে গেলেন।

হুমায়ূন ভাইয়ের সঙ্গে সমরেশদার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন মিনুভাই। আমার পরিচয়ও মিনুভাইর মাধ্যমেই। পরিচয়ের প্রথম দিন থেকেই আমি সমরেশদাকে তুমি বলি। গভীর ভালোবাসা থেকেই বলি। যেমন বলি, বেলাল চৌধুরী, রফিক আজাদ, মোহাম্মদ রফিক, রবিউল হুসাইনকে।

সমরেশদাকে আমার এই তুমি বলাটা একদমই পছন্দ করতেন না হুমায়ূন ভাই। এই নিয়ে আমাকে একদিন মৃদু বকাঝকা করলেন। ২০০৮ সালের কথা। তখন আমি *আনন্দবাজার পত্রিকা*-র আমন্ত্রণে কলকাতায় যাচ্ছি। 'মৈত্রী ট্রেন' উদ্বোধন হবে, সেই অনুষ্ঠানে। একসঙ্গে দুটো ট্রেন রওনা দেবে। একটা কলকাতা থেকে, একটা ঢাকা থেকে। *আনন্দবাজার পত্রিকা* ঠিক করেছে কলকাতা থেকে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় যাবেন ঢাকায়, যেতে যেতে একটা লেখা লিখবেন, আর ঢাকা থেকে আমি আসব, আসার পথে একটা লেখা লিখব, পরদিন *আনন্দবাজার পত্রিকা*-র ফার্স্টপেজে দুজনের রেলভ্রমণের অভিজ্ঞতার কথা লেখা হবে।

আগের রাতে গেছি হুমায়ূন ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে। তিনি সব শুনে বললেন, যাচ্ছ ভালো কথা কিন্তু সমরেশদার সঙ্গে দেখা হলে কিছুতেই তাঁকে আর তুমি করে বলবে না।

কলকাতায় যাব আর সমরেশদার সঙ্গে দেখা হবে না, এটা হতেই পারে না।

এক অনুষ্ঠানে দেখা হলো। লেখকদের কলকাতার স্মৃতি নিয়ে অনুষ্ঠান। নামকরা অনেক লেখক সেই অনুষ্ঠানে। আমাকে নিয়ে গেছেন ছড়াকার দীপ মুখোপাধ্যায়। গিয়ে আমি মুগ্ধ। সুনীল শীর্ষেন্দু সমরেশ নবনীতা দেবসেন এ রকম অনেকে। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক পবিত্র মুখোপাধ্যায়। সমরেশদার একটু তাড়া ছিল। তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করে মঞ্চ থেকে নেমে এলেন। আমি তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। কেমন আছেন, সমরেশদা ?

সমরেশদা গম্ভীর হয়ে গেলেন। তুমি কিন্তু আমাকে তুমি করে বলতে ? আজ আপনি আপনি করছো কেন ?

আমি আর বলার চান্স পেলাম না, হুমায়ূন ভাইয়ের ভয়ে বলছি।

হায় রে, আমার সেই শাসন করার মানুষটি নেই।

কলকাতায় হুমায়ূন ভাইকে ব্যাপকভাবে পরিচিত করাবার কাজটি করেছিলেন সমরেশদা। 'দেশ' পত্রিকায় পর পর আট বছর হুমায়ূন আহমেদের উপন্যাস ছাপা হয়েছে। 'দেশ' পত্রিকার সম্পাদককে হুমায়ূন আহমেদ সম্পর্কে বুঝিয়ে ছিলেন সমরেশদা। আমার ক্ষেত্রেও একই কাজ করেছিলেন। 'দেশ' পুজো সংখ্যা প্রতিবছর ছেপে যাচ্ছিল হুমায়ূন আহমেদের উপন্যাস, আর 'আনন্দলোক' ছাপছিল আমার উপন্যাস। আমাদের দুজনকে কী যে ভালোবাসেন তিনি।

সমরেশদা, তোমাকে কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা নেই আমার। মৃত্যু মুহূর্ত পর্যন্ত তোমার কাছে কৃতজ্ঞ থাকব আমি। আমাদেরকে কলকাতায় পরিচিত করাবার জন্য তুমি 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে আমাদের নিয়ে লিখেছিলে, 'সাপ্তাহিক বর্তমান' পত্রিকায় অনেকগুলো লেখা লিখেছিলে। খুব কম লেখকই অন্য লেখকের জন্য এই কাজ করেন। তুমি লেখক হিসেবে হিমালয়ের মতো, মানুষ হিসেবেও। জনপ্রিয়তায় আকাশ স্পর্শ করা লেখক হুমায়ূন আহমেদ চলে যাওয়ার পর তোমাকে আমি ফোন করেছিলাম। ফোনের একদিকে আমি কাঁদছি, আরেকদিকে তুমি। হুমায়ূন আহমেদের জন্য তোমার ভালোবাসা অক্ষয় হোক।

আরেকজন লেখকের কথা বলে এই লেখা শেষ করি।

তাঁর নাম রমাপদ চৌধুরী। খুবই গুরুগম্ভীর মানুষ। 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র 'রবিবাসরিয়' পাতা দেখেন। সমরেশদা হুমায়ূন ভাইকে নিয়ে গেছেন তাঁর কাছে। পরিচয় করিয়ে দিলেন। হুমায়ূন ভাই রমাপদ চৌধুরীর লেখা পছন্দ করেন। আমাকে বহুবার তাঁর 'দ্বীপের নাম টিয়া রঙ' বইটির কথা বলেছেন। পরিচয় হলো ঠিকই কিন্তু রমাপদ চৌধুরী তাঁর স্বভাবগত কারণেই তেমন কথাবার্তা বললেন না। হুমায়ূন ভাই তাঁর 'গল্পসমগ্র' বইটি রমাপদ চৌধুরীকে উপহার দিয়ে এলেন।

মাসখানেক পর রমাপদ চৌধুরীর একটা চিঠি এল হুমায়ূন ভাইয়ের কাছে। তিনি লিখেছেন, 'আমি আপনার গল্পগুলো পড়ে মুগ্ধ এবং বিস্মিত হয়েছি। আপনার বহু গল্প বাংলাসাহিত্যের স্থায়ী সম্পদ হিসেবে গণ্য হবে। আপনি একজন বিশাল মাপের লেখক।'

হায় রে, আমাদের সেই বিশাল মাপের লেখক নেই। আমাদেরকে দরিদ্র করে তিনি চলে গেছেন। এই বেদনা আমরা কোথায় রাখব!

হুমায়ূন আহমেদের অন্যরকম সাক্ষাৎকার

মিলন : হুমায়ূন আহমেদ, আপনি কেমন আছেন ?

হুমায়ূন আহমেদ : বেঁচে আছি।

মিলন : বেশির ভাগ মানুষকে যদি এ প্রশ্নটা করা হয়, তাঁরা বলেন, ভালো আছি। অথবা 'এই আছি আর কী'। কেউ কেউ কোনো কোনো সমস্যার কথা বলেন। আর আপনি শুধু বলেন, বেঁচে আছি। এ রকম বলার কারণ কী ?

হুমায়ূন আহমেদ : বাংলাদেশে আমি অনেক মৃত মানুষকে জীবিত ভঙ্গিতে ঘুরে বেড়াতে দেখি। এঁদের আত্মা মরে গেছে। তাঁরা তা জানেন না। তাঁদের যদি প্রশ্ন করা হয় কেমন আছেন, তাঁরা হাসিমুখে বলেন, ভালো আছি।

মিলন : আপনি এত বড় লেখক, বড় লেখকদের বাড়িভর্তি বই থাকবে, এমনই আমরা আশা করি। আপনার ফ্ল্যাটে তেমন বই দেখছি না কেন ? আপনার এই ফ্ল্যাটের সেলফে বইয়ের সংখ্যা কত ?

হুমায়ূন আহমেদ : এই মুহূর্তে আমার ফ্ল্যাটে বই আছে বারো শ' তেত্রিশ। এটা আমার লেখালেখির বারান্দা। যেসব বই লেখালেখিতে প্রয়োজন সেই বই-ই শুধু এখানে আছে। আমার নিজের লেখা বই একটিও নেই। তবে ঢাকার বাইরে নুহাশপল্লীর লাইব্রেরিতে অনেক বই আছে। দশ হাজারের বেশি বই আছে আমার গ্রামের শহীদ স্মৃতি বিদ্যাপীঠ স্কুলে। একটা কথা, লেখক হতে হলেই বিশাল লাইব্রেরি থাকতে হবে, তা না। প্রকাণ্ড লাইব্রেরির মালিকরা কেউই লেখক না।

মিলন : কয়েক বছর ধরে আপনি ছবি আঁকছেন। অনেক ছবিই এর মধ্যে এঁকেছেন। ছবি আঁকার ব্যাপারটি আপনার মধ্যে কীভাবে এল ?

হুমায়ূন আহমেদ : আমার সব ভাইবোনই শখের পেইন্টার। এটা বোধহয় 'জিনে'র কোনো ব্যাপার। তবে আমার বাবা-মা কাউকেই কখনো ছবি আঁকতে দেখি নি।

মিলন : ছেলেবেলায় বা বড় হয়ে ওঠার পর লেখালেখি শুরু করলেন। কিন্তু ছবি আঁকতে শুরু করলেন অনেকটা বয়সে...।

হুমায়ূন আহমেদ : Even an old dog can learn few new tricks.

মিলন : যাঁরা ছবি আঁকেন, তাঁদের প্রধান উদ্দেশ্য ছবির প্রদর্শনী করা। কখনো কখনো পত্রপত্রিকায় নিজের আঁকা ছবি ছাপাবার ব্যবস্থা করা। অর্থাৎ প্রচারের একটা লক্ষ্য থাকে। আপনার সে রকম কিছুই আমাদের চোখে পড়ে নি। কেন ?

হুমায়ূন আহমেদ : আমি খুবই নিশুমানের পেইন্টার। আমার আঁকা ছবি বন্ধুবান্ধবকে দেখানো যায়। এর বাইরে না। নিজের সীমাবদ্ধতা আমি জানি।

মিলন : ম্যাজিকে আপনার গভীর উৎসাহ। ম্যাজিকের বই পড়া, ম্যাজিক প্র্যাকটিস করা—এ ব্যাপারটি নিয়ে মেতে থাকতে আপনি খুব পছন্দ করেন। ম্যাজিকের প্রতি আপনার এই আকর্ষণ কীভাবে জাগল ?

হুমায়ূন আহমেদ : 'ম্যাজিক মুন্সি' লেখায় আমার ম্যাজিকের প্রতি আগ্রহের কারণ ব্যাখ্যা করেছি। আর কিছু বলতে ইচ্ছা করছে না। একই কথা বারবার বলা ক্লান্তিকর ব্যাপার।

মিলন : এ পর্যন্ত শ' খানেক গান আপনি লিখেছেন। আপনার লেখা কোনো কোনো গান আকাশচুম্বী জনপ্রিয়। যেমন—'এক যে ছিল সোনার কন্যা', 'ও আমার উড়াল পঙ্খী রে'। আপনি সেভাবে কখনো কবিতা চর্চা করেন নি। গান লেখার ব্যাপারটিতে কেমন করে জড়ালেন ?

হুমায়ূন আহমেদ : বেশির ভাগ গানই প্রয়োজনের তাগিদে লেখা। যেমন ছবির জন্য গান দরকার, অন্য কারও কাছে না গিয়ে নিজেই লিখলাম। গানে আমার ভূমিকার চেয়ে সুরকার এবং গায়ক-গায়িকার ভূমিকা প্রধান। পত্রিকার পোস্ট-এডিটরিয়ালেও সুন্দর সুর বসালে এবং ভালো কাউকে দিয়ে গাওয়ালে সুন্দর গান হবে।

মিলন : আপনি কয়েকটি দুর্দান্ত বিজ্ঞাপন চিত্র নির্মাণ করেছিলেন। বিজ্ঞাপন চিত্রের স্ক্রিপ্ট করেছিলেন। এ কাজগুলো এখন আর করছেন না কেন ?

হুমায়ূন আহমেদ : বিজ্ঞাপন তো নিজের আগ্রহে কেউ করে না। অন্যের আগ্রহে করা হয়। কেউ আমাকে এখন আর বিজ্ঞাপন বানাতে ডাকে না।

মিলন : একবার ঈদে দেশ টিভির জন্য আপনি একটি অনুষ্ঠানে উপস্থাপনা করেছেন। অনুষ্ঠানটির পরিচালকও ছিলেন আপনি। পরিচালক হুমায়ূন আহমেদ নন, আমরা কথা বলতে চাইছি উপস্থাপক হুমায়ূন আহমেদকে নিয়ে। এ বিষয়ে তিনি কী বলেন ?

হুমায়ূন আহমেদ : নুহাশপল্লীর নিতান্ত ঘরোয়া অনুষ্ঠানে উপস্থাপনটা গৌণ। নিজের ঘরে কথা বলার মতো। তবে জীবনের প্রথম উপস্থাপনাটা কিন্তু জাপানে। বাংলাদেশ থেকে বিশাল একদল নিয়ে গিয়েছি। উপস্থাপক নিয়ে যাই নি, কাজেই বাধ্য হয়ে উপস্থাপনা।

মিলন : ভবিষ্যতে আপনি কি উপস্থাপনা করবেন ? সবকিছুই তো করলেন, এটা বাদ থাকবে কেন ?

হুমায়ূন আহমেদ : আমার চেহারা খারাপ, কণ্ঠস্বর খারাপ, ভাষা আঞ্চলিকতা দোষে দুষ্ট। এইসব ত্রুটি নিয়ে লেখক হওয়া যায়, উপস্থাপক হওয়া যায় না।

মিলন : আপনি কিছু অবিস্মরণীয় ভূতের গল্প লিখেছেন। আমরা মনে করি, সেইসব গল্প বাংলা সাহিত্যের স্থায়ী সম্পদ হিসেবে পরিগণিত হবে। ভূত নিয়ে আপনার নিজের ভাবনাটা কী রকম ? আপনি ভূতে বিশ্বাস করেন ?

হুমায়ূন আহমেদ : ভূত বিশ্বাস করি না, কিন্তু ভয় নামক অনুভূতিটি বিশ্বাস করি। আমার কাজ ভয় নিয়ে, ভূত একটা উপলক্ষ মাত্র।

মিলন : আপনার লাইব্রেরি ভর্তি বিজ্ঞানের বই। বিজ্ঞান বিষয়ে কিছু বলুন।

হুমায়ূন আহমেদ : বিজ্ঞান আমাকে প্রবলভাবে আলোড়িত করত। মনের ভেতর সবসময় অতৃপ্তির হাহাকার, কবে মানুষ সব জানতে পারবে ?

মিলন : ধর্ম নিয়ে আপনার ব্যাপক পড়াশোনা। নানা রকমের ধর্মীয় বই আপনি পড়ছেন। আপনার ধর্মভাবনা কী রকম ?

হুমায়ূন আহমেদ : আমি অত্যন্ত গোঁড়া মুসলিম পরিবার থেকে এসেছি। উৎসাহের শুরুটা সেখানে। আমি প্রচণ্ড আস্তিক, তবে...পরের উত্তর দেব না।

মিলন : আপনি একজন বৃক্ষপ্রেমী মানুষ। বৃক্ষের প্রতি আপনার আকর্ষণ এবং মমত্ববোধের কথা আমরা জানি। *বৃক্ষকথা* নামে আপনি একটি বইও লিখেছেন। বৃক্ষের প্রতি আপনার এই আকর্ষণ কীভাবে জাগল ?

হুমায়ূন আহমেদ : 'লোকমান হেকিম' গাছের সঙ্গে কথা বলতে পারতেন। আমি কথা বলতে পারি না, তবে গাছের অনুভূতি সামান্য হলেও ধরতে পারি। হয়তোবা এ কারণেই।

মিলন : আপনি খান খুব কম। কিন্তু আপনি একজন রসনাবিলাসী মানুষ। আপনার বইয়ের কোনো কোনো তাকভর্তি শুধুই রান্নার বই। রান্না বিষয়ে আপনার এত আগ্রহ কেন ?

হুমায়ূন আহমেদ : কম খেলেও ভালো খেতে পছন্দ করি। রান্না যে-কোনো জাতির সংস্কৃতির একটা বড় অংশ। বিভিন্ন দেশের রান্নার বই পড়ি ওই দেশ সম্পর্কে ভালোমতো জানার জন্য।

মিলন : আপনি একসময় বন্ধুবান্ধব নিয়ে বাংলাদেশ প্রায় চষে বেড়িয়েছেন। বেড়াবার নেশাই ছিল আপনার। বিদেশেও অনেক বেড়িয়েছেন। এখনো কি সেভাবে বেড়ান ?

হুমায়ূন আহমেদ : গর্তজীবী হয়ে গেছি। নিজেকে সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন করার মধ্যেও কিন্তু আনন্দ আছে। জনতার মধ্যে যেমন আছে 'নির্জনতা', আবার নির্জনতার মধ্যেও আছে 'জনতা'।

মিলন : লেখকরা সাধারণত একা থাকতে পছন্দ করেন। একাকী ঘুরে বেড়ানো বা নিজের জন্য ভাবনার সময় বের করা। কিন্তু আপনি সেভাবে একা কখনো থাকেন

না। চারপাশে আড্ডা, বন্ধুবান্ধব, হইচই পছন্দ করেন। তাহলে আপনার ভাবনার সময়টা কখন ?

হুমায়ূন আহমেদ : যে-কোনো মানুষ একগাদা বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে গল্প করতে করতেও নিজের একান্ত ভাবনা ভাবতে পারে। আমি তা-ই করি।

মিলন : একজন মানুষ এত কাজ একা কী করে করে ?

হুমায়ূন আহমেদ : আমি অনেক দিন থেকেই বেকার। বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি অনেক আগেই ছেড়ে দিয়েছি। বেকারের হাতে থাকে অফুরন্ত সময়।

মিলন : আগামী দিনের জন্য আপনার কাজের পরিকল্পনা কী ?

হুমায়ূন আহমেদ : আমি বাস করি বর্তমানে। ভবিষ্যতে না। কাজেই কোনো পরিকল্পনা নেই।

মিলন : 'আনন্দ'–এ ব্যাপারটিকে আপনি কীভাবে দেখেন ?

হুমায়ূন আহমেদ : ১৯৭১ সালে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে আসার পর বেঁচে থাকার প্রতিটি মুহূর্তই আমার জন্য আনন্দের। শাওনের সঙ্গে যখন ঝগড়া করি তখনো আনন্দ পাই। মনে হয় বেঁচে আছি বলেই তো ঝগড়া করতে পারছি। আমি যে আপনি কেমন আছেন প্রশ্নের উত্তরে 'বেঁচে আছি' বলি, এটাও একটা কারণ। 'জীবন' পরম করুণাময়ের অতি পবিত্র এক উপহার। এই উপহার নিয়ে নিরানন্দে থাকার কোনো উপায় নেই।

প্রিয় হুমায়ূন আহমেদ

বাবার মৃত্যুর পর আমি বাকরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম।

চার দিন কথা বলতে পারি নি। নিঃশব্দে চোখের জলে ভেসেছি। ১৯৭১ সালের কথা। সেই ঘটনার ৪১ বছর পর গতরাত (বৃহস্পতিবার, ১৯ জুলাই) থেকে আমি বলতে গেলে বাকরুদ্ধই হয়ে আছি। বিভিন্ন পত্রপত্রিকা আর টিভি চ্যানেলগুলো থেকে অবিরাম ফোন এসেছে, কত বন্ধুবান্ধব, প্রিয়জন ফোন করেছেন, ফোন ধরার পরই গলা বন্ধ হয়ে এসেছে। চোখের জলে গাল ভাসতে শুরু করেছে।

হুমায়ূন ভাই নেই, এই বেদনা আমি নিতে পারছি না।

গত কয়েক দিন নানা রকমের খবর রটছিল। বিভিন্ন পত্রপত্রিকা, টিভি চ্যানেল প্রচার করছিল তাঁর অবস্থা সংকটাপন্ন। *কালের কণ্ঠে* সংকটাপন্ন শব্দটা লিখতে আমি মানা করলাম। এই শব্দ আমি সহ্য করতে পারছিলাম না। বুধবার সন্ধ্যায় আমেরিকায় ফোন করে মাজহারের কাছে খবর নিয়েছি। তিনি বলেছেন, অবস্থার সামান্য উন্নতি দেখা যাচ্ছে। শুনে চাপ ধরা বুক খানিকটা হালকা হলো। বৃহস্পতিবার বাসায় ফিরছি, রাত ৯টার দিকে নাট্যব্যক্তিত্ব মামুনুর রশীদ ফোন করলেন। কণ্ঠে উদ্বিগ্নতা। হুমায়ূনের খবর কী, বলো তো ? মন খারাপ করা সব কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছি।

রাত ১১টার দিকে ফরিদুর রেজা সাগর ফোন করে বললেন, যখন তখন অশুভ সংবাদটা আসবে। মন শক্ত করো।

ঘণ্টাখানেক পর সেই সংবাদ এলো। টেলিভিশন স্ক্রলে উঠতে লাগল, নন্দিত কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদ...

এর পর থেকে আমার চারপাশে শুধুই হুমায়ূন আহমেদ। মাথা শূন্য হয়ে গেল, বুক ফাঁকা হয়ে গেল। চোখজুড়ে শুধুই হুমায়ূন আহমেদের প্রিয়মুখ। কত দিনের কত ঘটনা মনে এলো, আমাদের কত স্মৃতি, কত আনন্দ-বেদনার দিন। যে বেলভ্যু হাসপাতালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ফেললেন, ১০-১২ বছর আগে আমরা কয়েকজন তাঁকে সেই হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলাম। তাঁর হার্টের সমস্যা। এনজিওগ্রাম করাবেন। আর্কিটেক্ট করিম ভাই, অন্যপ্রকাশের মাজহার, কমল আর আমি, আমরা গেলাম তাঁর সঙ্গে।

যাওয়ার দিন সন্ধ্যাবেলাটার কথা আমার মনে আছে। আমরা সবাই ব্যাগ সুটকেস নিয়ে তাঁর দখিন হাওয়ার ফ্ল্যাটে। হুমায়ূন ভাই দলামোচড়া করে দু-তিনটা শার্ট-প্যান্ট ভরলেন একটা ব্যাগে, পাসপোর্ট-টিকিট হাতে নিলেন, ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে বললেন, চলো।

আমি অবাক। আপনি আমেরিকায় যাচ্ছেন, না কুতুবপুর ?

নিউইয়র্কে তখন একটা বইমেলারও আয়োজন করেছিল মুক্তধারার বিশ্বজিৎ সাহা। কলকাতা থেকে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় আর সমরেশ মজুমদার গেছেন। হুমায়ূন ভাই আর আমিও অতিথি। একই হোটেলে উঠেছি সবাই। কী যে আনন্দে কাটল কয়েকটা দিন! এনজিওগ্রাম করানো হলো হুমায়ূন ভাইয়ের। এক রাত হাসপাতালে থাকতে হবে। কিন্তু ওই একটা রাত একা হাসপাতালে থাকবেন তিনি, এটা কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলেন না। শিশুর মতো ছটফট করতে লাগলেন, চঞ্চল হয়ে গেলেন। আমরা নানা রকমভাবে প্রবোধ দিয়ে তাঁকে একটা রাত বেলভ্যুতে রাখতে পেরেছিলাম।

চারপাশে বন্ধুবান্ধব ছাড়া তিনি থাকতেই পারতেন না। একা চলাফেরা করতে পারতেন না। তিনি চলতেন সম্রাটের মতো। চারপাশে আমরা কয়েকজন তাঁর পারিষদ।

হুমায়ূন ভাই, যে জগতে আপনি চলে গেলেন, সেখানে একা একা আপনি কেমন করে থাকবেন ? সেখানে তো আপনার পাশে আপনার মা নেই, শাওন নেই, নিষাদ-নিনিত নেই, মাজহার নেই, আমরা কেউ নেই।

আমার ৫০তম জন্মদিনে আমাকে নিয়ে *প্রথম আলো*-তে একটা লেখা লিখলেন হুমায়ূন ভাই, 'কী কথা তাহার সাথে'। (এই নামে 'এনটিভি'তে আমি তখন একটা প্রোগ্রাম করতাম। হুমায়ূন ভাইকে নিতে চেয়েছি, তিনি যান নি। শাওনকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।) তাঁর স্বভাব ছিল যে-কোনো লেখা লিখলেই সন্ধ্যার পর বন্ধুবান্ধব নিয়ে বসে সেই লেখা পড়ে শোনাতেন। ওই লেখাটাও পড়তে লাগলেন। আমি বসে আছি তাঁর পাশে। আলমগীর রহমান, মাজহার, আর্কিটেক্ট করিম—আমরা মুগ্ধ হচ্ছি তাঁর লেখায়। আমার মুখে শোনা আমার কিশোর বয়সের এক দুর্দিনের বর্ণনা দিয়েছিলেন তিনি। সেই অংশটুকু পড়তে পড়তে আমাকে জড়িয়ে ধরে শিশুর মতো কাঁদতে লাগলেন।

কী গভীর ভালো তিনি আমাকে বেসেছেন, আমি ছাড়া কেউ তা জানে না।

কালের কণ্ঠে তিনি বহু লেখা লিখেছেন। শুরু থেকেই। আমি গিয়ে জোর করে তাঁর লেখা নিয়ে আসতাম। একদিন বললেন, দেড়-দুই বছরে *কালের কণ্ঠে* যত লেখা লিখলাম, জীবনে কোনো পত্রিকায় এত অল্প সময়ে এত লেখা আমি লিখি নি। কেন লিখেছি জানো ? তোমার জন্য।

আগরতলায় বেড়াতে গিয়ে পুরনো একটা মন্দির দেখতে গিয়েছি আমরা। পুরোদল। জনা ১০-১২ লোক। সেই মন্দিরের সামনে আদূরে ছেলে যেমন করে অনেক

সময় পেছন থেকে জড়িয়ে ধরে বাবাকে, ঠিক সেভাবে দুই হাতে আমি তাঁকে জড়িয়ে ধরলাম। দুজনেরই গভীর আনন্দিত হাসিমুখ। মাজহার ছবি তুললেন। হুমায়ূন ভাই হাসতে হাসতে বললেন, মনে হলো আমার একটা পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সের ছেলে আছে।

আমার বয়স তখন পঁয়তাল্লিশ।

ক্যান্সার চিকিৎসার জন্য তিনি নিউইয়র্কে চলে যাওয়ার পর *কালের কণ্ঠের* সাহিত্য ম্যাগাজিন 'শিলালিপি'তে তাঁকে নিয়ে আমি একটা ধারাবাহিক লেখা শুরু করলাম। 'হুমায়ূন আহমেদ এবং হুমায়ূন আহমেদ'। একটু নতুন আঙ্গিকে লেখা। আমার স্মৃতিচারণা আর তাঁর ইন্টারভিউ। এই ইন্টারভিউটা 'অন্যদিন' পত্রিকায় একসময় ছাপা হয়েছিল। সেটাকেই নতুন আঙ্গিকে পরিবেশন করা। ১৩ পর্বে লেখাটা শেষ হলো।

নিউইয়র্কে বসে হুমায়ূন ভাই একটু রাগলেন। আমাকে নিয়ে একটা লেখা লিখলেন, 'মিলন কেন দুষ্টু'। সেই লেখায় আমাকে মৃদু বকাঝকাও করলেন। তাঁর সম্মানে কালের কণ্ঠের প্রথম পৃষ্ঠায় লেখাটা আমি ছেপে দিলাম।

কিছুদিন আগে দুই সপ্তাহের জন্য তিনি দেশে এসেছিলেন। উঠেছিলেন তাঁর প্রিয় নুহাশপল্লীতে। সেখান থেকে এলেন ধানমণ্ডির দখিন হাওয়ায়। এক রাতে দেখা করতে গেছি। তিনি তাঁর অন্ধকারাচ্ছন্ন রুমটায় চেয়ারে বসে আছেন। শাওন আছে পাশে, মাজহার আছে। একপাশে বসে আছেন স্থপতি ও লেখক শাকুর মজিদ। আলমগীর রহমান এলেন, মাজহারের স্ত্রী স্বর্ণা এলো। আমি বসে আছি হুমায়ূন ভাইয়ের পায়ের কাছে। তাঁর মুখটা আর আগের মতো নেই। কালো হয়ে গেছে। মাথার চুল গেছে অনেকটা পাতলা হয়ে। আর শরীরও কেমন যেন ভারী মনে হলো আমার।

ওজন কি একটু বেড়েছে?

দু-চার কথার পর হঠাৎ তিনি আমার মাথায় হাত রাখলেন, গভীর মায়াবী গলায় বললেন, ওই লেখাটার জন্য মন খারাপ করেছিলে? বললেন এমন করে, আমি তাঁর হাত ধরে ঝরঝর করে কেঁদে ফেললাম।

হুমায়ূন ভাই, বৃহস্পতিবার রাত থেকে আপনার জন্য শুধু আমি নই, পুরো বাংলাদেশ কাঁদছে। অমিত হাবিবের কথা আপনার মনে আছে। সংবাদপত্রজগতের অত্যন্ত মেধাবী যুবক। মাত্র এক রাতে কয়েক ঘণ্টা আপনার সঙ্গে আড্ডা দিয়েছিল অমিত। আমিই তাকে আপনার কাছে নিয়ে গিয়েছিলাম। রাত ১টার দিকে ফোন করে অমিত কাঁদতে লাগল। ফোনের একদিকে আমি কাঁদি, আরেক দিকে অমিত। বাংলাদেশের সর্বস্তরের মানুষ আপনাকে পাগলের মতো ভালোবেসেছে। যে আপনার কাছে গেছে, সে তো বটেই, দূর থেকে যারা আপনাকে দেখেছে, আপনার লেখা পড়েছে, নাটক-সিনেমা দেখেছে, আপনার লেখা গানগুলো শুনেছে, তারা যেমন ভালো আপনাকে বেসেছে, পৃথিবীর খুব কম মানুষের ভাগ্যেই এ রকম ভালোবাসা জোটে। আপনি চলে গেছেন, বাংলাদেশ আজ চোখের জলে ভাসছে। আমাদের

চারদিক অনেকটাই অন্ধকার। শ্রাবণ দিনে আপনি চলে গেলেন আর আমাদের আকাশ ছেয়ে গেল শ্রাবণ মেঘে। এই মেঘ চোখের জলের বৃষ্টি হয়ে ঝরছে।

হুমায়ূন ভাই, আপনার মনে আছে, একদিন নুহাশপল্লীতে ঢোকার মুখে, গেটের বাইরের দিকটায় দুপুরের নির্জনতায় আপনি ও আমি হাঁটছিলাম। আমাদের পায়ের কাছে ফুটে আছে কিছু সাদা রঙের ছোট ছোট বুনোফুল। তেমন গন্ধ নেই। আপনি হঠাৎ করে জিজ্ঞেস করলেন, এগুলো কী ফুল, বলো তো?

প্রথমে আমি চিনতে পারলাম না। আপনি বললেন, বিভূতিভূষণ এই ফুলের কথা অনেকবার লিখেছেন।

বুঝে গেলাম। ভাঁটফুল।

আপনার নুহাশপল্লী গেটের কাছে বছর বছর ফুটতে থাকবে ভাঁটফুল, নুহাশপল্লীর সবুজ মাঠ আরও সবুজ হবে বর্ষার বৃষ্টিতে, আপনার ওষুধি বাগান হয়ে উঠবে বাংলাদেশের অমূল্য সম্পদ। নুহাশপল্লীর ফুলের ঝোপ রঙিন হবে বসন্তকালে, গাছপালায় বইবে চৈতালী হাওয়া, আপনার পুকুরের জলে শ্বাস ফেলতে উঠবে মাছেরা, পাখিরা মুখর হবে সকাল-দুপুর-সন্ধ্যায়। গভীর রাতে দূরে ডাকতে থাকবে দুরন্ত কোকিলেরা। শিউলি ফুলের মতো জ্যোৎস্নায় ফুটফুট করবে আপনার তৈরি করা এক টুকরো পৃথিবী। শ্রাবণ দিনের বৃষ্টি আপনার শোকে কাতর হবে, নুহাশ পল্লীর মাঠ ভাসবে চোখের জলে, ফুলেরা ভুলে যাবে গন্ধ ছড়াতে, মুখর পাখিরা স্তব্ধ হবে, জ্যোৎস্না রাত ম্লান হবে। দুরন্ত কোকিল আর ডাকতে চাইবে না। আমাদের বইমেলাগুলো ম্রিয়মাণ হয়ে যাবে, প্রকাশকরা হারাবেন উদ্দীপনা। ঈদসংখ্যাগুলো হারাবে জৌলুস। টেলিভিশন পর্দা আলোকিত হবে না আপনার নতুন নাটকে। মাইক্রোবাস ভরে আমরা আর আড্ডা দিতে যাব না নুহাশ পল্লীতে, দখিন হাওয়া মুখর হবে না হাসি-আনন্দে। আমরা নিঃস্ব হয়ে গেলাম।

আপনার সর্বশেষ উপন্যাস 'দেয়াল' ১৬০ পৃষ্ঠার মতো লিখে ড. আনিসুজ্জামান, ড. সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম ও আমাকে পড়তে পাঠিয়েছিলেন। আমাদের মতামত জেনে লেখা শেষ করবেন। আপনার লেখা দেয়াল উপন্যাসের ওই ১৬০ পৃষ্ঠার দিকে তাকিয়ে আমার মনে হচ্ছে লিখতেই লিখতেই যেন উঠে চলে গেলেন আপনি। টেবিলে অসহায় ভঙ্গিতে পড়ে আছে আপনার কলম আর সাদা কাগজ।

সাদা কাগজ, তোমাকে কে বোঝাবে হুমায়ূন আহমেদ চলে যান নি। এই তো বাঙালি পাঠকের বুকসেলফগুলোতে রয়ে গেছেন তিনি, টেলিভিশন চ্যানেলগুলোতে রয়ে গেছেন, বাংলাদেশের সিনেমায় রয়ে গেছেন। তাঁর গান রয়ে গেছে সুবীর নন্দী, শাওন আর অন্যান্য শিল্পীর কণ্ঠে। আর তিনি রয়ে গেছেন বাঙালি জাতির অন্তরে।

যে অপার্থিব জগতে আপনি আছেন, সেখানে ভালো থাকুন, আনন্দে থাকুন হুমায়ূন ভাই। পরম করুণাময় আপনাকে গভীর শান্তিতে রাখুক।

—